আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালার দ্বাদশ বই

জার্মানীতে নেতাজী

নেতাজী

সুভাষচন্দ্র বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

অনুবাদক :

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

ঋষি দাস

প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট শিল্পী

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—বীরেন সিমলাই

নববিধান প্রেস

৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দেড় টাকা

অন্তর্ধানের পর

১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের হঠাৎ অন্তর্ধানের চমকপ্রদ খবর প্রথম ঘোষণা করা হল সরকারী তরফ থেকে। সুভাষচন্দ্র ছাড়া পেয়েছেন জেল থেকে এবং বাড়ীর মধ্যে পুলিশ পাহারায় দিন কাটাচ্ছেন এইটুকুই লোকে জানতো। বিশেষ করে দেশের রাজনীতির জটিলতা তখন এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে সুভাষচন্দ্রের পরবর্তী কর্মপন্থা যে কি, তা অনেকেই আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। তাই এই অদ্ভুত অন্তর্ধান কাহিনী শুনে সকলেই বিস্মিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়লো। বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র কি রাজনীতির কণ্টকময় পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন ?

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের জীবন এবং জীবনদর্শন অতি বিচিত্র! বিচিত্র এই অর্থে, যে, প্রায় প্রত্যেক বড় বড় নেতাদের জীবনে ধর্মভাবের একটা দিক আছে। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতি সর্বভারতীয় নেতারা ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একটা অপূর্ব সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন বা করে আসছেন। বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী সুভাষচন্দ্র কি শেষ পর্যন্ত ধর্ম-জীবনকেই জীবনের চরম আদর্শ বলে মেনে নিয়ে সংসার ত্যাগ করলেন ?

এই সন্দেহ আর এক দিক থেকে বিচার করেও সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর তাঁর শয়নগৃহে ব্যাঘ্রচর্ম, গীতা ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া একথা সকলেই জানে যে অন্তর্ধানের কিছুদিন আগে থেকে তিনি দাড়ি রাখছিলেন, কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, কথা বলতেন না। এই সবই যে বৈরাগ্যের নিদর্শন সে কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই অনেকে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলেন যে রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুভাষচন্দ্র বিবাগী

হয়ে গেছেন। কেউ কেউ এবং সরকার পক্ষ এমনও সন্দেহ করলেন যে বেলুড় মঠ থেকে সুভাষচন্দ্রের পুনরুদয়ও নাকি অসম্ভব নয়!

কিন্তু সে সব কথা যে সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন সে কথা জাগ্রত ইতিহাস রক্তের দাগে প্রমাণ করে দিয়েছে। এবং যখন বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্রের প্রথম বক্তৃতা শোনা গেল তখন সকলেই বিশ্বাস করতে পেরেছিল যে তিনি সত্যিই প্রচণ্ড ধরণের এক বিপ্লবের জন্ম দিতে চলেছেন,—তাঁর অনির্বাণ কর্মোদ্যমের এবং কর্মনিষ্ঠার ওপর একটা শ্রদ্ধা সকলেরই ছিল। এইখানেই দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় মেলে!

সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান যেমন একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা তেমনি জগতের ইতিহাসে আরও দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা পর পর এমন ভাবে ঘটে গেল বছর খানেকের মধ্যে, যে, মানুষের বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম করে গেল। তারপর থেকে মানুষের ধারণা হয়ে গেল যে এ যুগে, রাজনীতির পটভূমিকার অতি-দ্রুত বড় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন অসম্ভব ঘটনাই সম্ভব হওয়া বিস্ময়কর নয়!

প্রথম চাঞ্চল্য জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণ। ২২শে জুন ১৯৪১। যুদ্ধের আগে সুভাষচন্দ্রের এমন ধারণা ছিল এবং সে ধারণার কথা বহুবার তিনি প্রকাশ করে বলেছেন, যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধে বৈদেশিক সাহায্য পেতে গেলে একমাত্র রাশিয়ার কাছ থেকেই সেটা আশা করা সম্ভব। কারণ সারা পৃথিবীতে রাশিয়াই একমাত্র দেশ যাদের সত্যিকারের শোষিত ও নির্যাতিতের ওপর সহানুভূতি আছে। কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় এ আশা অস্তমিত হল।

যতদিন জার্মানী ব্রিটিশকে ক্রমাগত আক্রমণে নাস্তানাবুদ করে তুলছিল ততদিন সমগ্র ভারতবাসীর একটা সহানুভূতি ছিল জার্মানীর ওপর। সকলেই এই অত্যাচারী ব্রিটিশ জাতকে বিপর্যস্ত হতে দেখে আনন্দ অনুভব করতো এবং মনে মনে সকলেই জার্মানীর জয় কামনা করতো। তা সে ফ্যাসিস্টই হোক আর যাই হোক! ওদিকে রাশিয়ার সাম্যবাদ এবং নীচুস্তরের মানুষের

নবজাগরণ ও নব মর্যাদাবোধ ভারতকেও জাগিয়ে তুলেছিল। সকলেই রাশিয়াকে শ্রদ্ধা করে, রাশিয়া সম্বন্ধে জানতে চায়। তাই দেখা যাচ্ছে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মান ও রাশিয়া এ দুই দেশকেই ভারত বন্ধু হিসাবে দেখছে। আর এদিকে সুভাষচন্দ্র চাইছেন রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের এক নবতর অধ্যায়ের সৃষ্টি করতে। কিন্তু জার্মানী হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করায় সবকিছুই গোলমাল হয়ে গেল। একদিকে জার্মানী যেমন ভারতবর্ষের সহানুভূতি হারালো অন্যদিকে রাশিয়া পরোক্ষে বিটেনের বন্ধু হয়ে পড়ায় তার উপরও সম্পূর্ণ আস্থা আর রইলো না। সুভাষচন্দ্রও তাঁর কর্মপন্থাকে কার্যে পরিণত করতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন।

দ্বিতীয় চাঞ্চল্য,—জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১। জাপান এশিয়ার মহৎ দেশ। যথেষ্ট শক্তিশালী ও কুটকৌশলী এই জাপানীরা। তাছাড়া জাপান প্রথম আক্রমণেই মিত্রশক্তিকে যেভাবে নাকাল করে ছাড়লো তাতে স্বভাবতই ভারতের সহানুভূতির কিয়দংশ গিয়ে পড়লো জাপানীদের উপর। জাপানীরা হয়ত বর্বর বিটিশকে শেষ আঘাত দিয়ে ধরাশায়ী করে দেবে। বিস্মিত ভারতবাসী জাপানী সৈন্যের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ কান পেতে শুনতে লাগলো।

এদিকে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা সংঘটিত হল ভারতবর্ষে। সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ শরৎচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন জাপানের সঙ্গে গুপ্ত সহযোগিতার অপরাধে। রাজনৈতিক স্পন্দন দ্রুততর হল।

রাশিয়ার সাহায্য যখন হস্তচ্যুত হয়েছে তখন সুভাষচন্দ্র দেখলেন চক্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলানো ছাড়া উপায় নেই। এদের সাহায্যেই তাঁকে কার্যোদ্ধার করতে হবে। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে ছল বল, কৌশল এ তিনটি পথের সাহায্য নিতে হয়। এইটেই হল যুদ্ধের আদর্শ। সে আদর্শ মহৎ মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না। তাই রণধীর সুভাষচন্দ্র, সাম্যবাদী সুভাষচন্দ্র চক্রশক্তির সঙ্গেই যোগদান করলেন।

১৯৪১ সালে ১০ই মে তারিখে রিবেনট্রপ, মুসোলিনী ও কাউন্ট সিয়েনোর মধ্যে এক আলোচনা হয়। সেখানে স্থির হয় যে ইংরেজ-নিপেষিত সমস্ত পরাধীন রাজ্যের স্বাধীনতা-যুদ্ধে চক্রশক্তি যে সাহায্য করতে প্রস্তুত এই মর্মে প্রচার কার্য চালাবার ব্যবস্থা করা হোক। ইতিপূর্বেই বহু অর্থব্যয়ে ইটালী ইপির ফকির এবং জেরুসালেমের গ্র্যাণ্ড মুফতিকে এই প্রচার কার্যে নিযুক্ত করেছিল। এরপর ভারতের বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র বার্লিনে এসে পড়ায় চক্রশক্তি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের প্রচার বিভাগের পরিচালকরূপে নিযুক্ত করলেন। তবে এমনভাবে প্রচারকার্য চলতে থাকলো যে অতিসহজেই ভারতবাসীর মন আকৃষ্ট হতে পারে এবং গান্ধীপন্থিদের সঙ্গে কোনরকম সংঘাত না হয়। ১৯৪২ সালে মার্চমাসে বার্লিন রেডিও থেকে সুভাষচন্দ্রকেই স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে জগত সমক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হল।

যুগপৎ জার্মানী ও জাপানের তড়িৎ আক্রমণে মিত্রশক্তি যখন বিধ্বস্ত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন টলমল, তখন বার্লিন থেকে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বেতারের মধ্যদিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

ভারতের এ যুগের সূর্য পূর্বপ্রান্ত থেকে আরও পশ্চিমে গিয়ে উদিত হলেন। পূবের দেশে তখন বিভ্রান্তির সমূহ অন্ধকার।

বার্লিন থেকে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন যে চক্রশক্তি সর্বতোভাবে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করতে প্রস্তুত। ভারতবাসীরা যদি দেশের মধ্য থেকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সামান্য আন্দোলন চালায় তাহলে বাকি কাজ তিনি বাইরে থেকে সম্পন্ন করতে পারেন। এই সময়ে রাজা গোপালাচারী যে আপোষ প্রস্তাব নিয়ে মাতামাতি করছিলেন সুভাষচন্দ্র বক্তৃতার মধ্যে সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবার জন্যে ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে অনুরোধ করেন। এই সময়ে ব্রিটিশ সরকার ইংল-রুশ আপোষ-বিশারদ স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন ভারতের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা করবার জন্যে। সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবও যাতে গৃহীত না হয় তার জন্য প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।

ধ্বনি করে একের পর এক তাঁর বক্তৃতা চলতে থাকে। এবং দুঃখের বিষয় এই য ভারতে ক্রীপস প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হয়।

এই বক্তৃতাগুলি যে ভারতবাসিদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য সরকার পক্ষ থেকে নানারকম কঠোর বিধানের ব্যবস্থা হতে থাকে। ঐ সব বক্তৃতার কথা কাগজে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হয়। বেতারযন্ত্র সম্বন্ধেও নানারকম কড়াকড়ি ব্যবস্থা হতে থাকে। এদিকে বহু অর্থব্যয়ে সরকার পক্ষ থেকে 'ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট' নামে এক প্রচার বিভাগ খোলা হয়। টাকার লোভে বহু লোক এবং সুভাষচন্দ্রের পূর্বতন বন্ধুদের মধ্যেও কয়েকজন এই ফ্যাসিস্ত-বিরোধী ও তথা সুভাষ-বিরোধী প্রচারকার্যে যোগ দেন। সরকারের [illegible] ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিও এই বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করতে থাকে সব বিষয়ে।

কিন্তু মেঘের আড়াল থেকেও সূর্য আলো দেয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী কান পেতে থাকে বেতারযন্ত্রে। এই সময়ে এমন এক গুজব রটে যে বার্লিন থেকে যিনি বক্তৃতা করেন তিনি নকল সুভাষচন্দ্র, আসল সুভাষ চন্দ্র ন'ন। কিন্তু যাঁরা তাঁর আসল বক্তৃতা শুনেছেন তাঁদের কাছে এ ধাপ্পা কার্যকরী হয় না। ইতিমধ্যে দেখা দেয় দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ—পঞ্চাশের মন্বন্তর। শোনা যায় সুভাষচন্দ্র কয়েক লক্ষ টন চাল ভারতে পাঠাতে চেয়েছিলেন রেডক্রস মারফৎ। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাব ব্রিটিশের তরফ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়।

ক্রীপস্ প্রস্তাব বর্জনের পর ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। গান্ধীজী এক নতুন অস্ত্র নিয়ে উদিত হন ভারতের রাজনৈতিক আকাশে। সে অস্ত্র শুধু দুটি শব্দ। দুটি চকমকি পাথরের টুকরো যা ঘষলে আগুন জ্বলে—Quit India—ভারত ছাড়ো।

কিন্তু এ অস্ত্র সুভাষচন্দ্রের কাছে নূতন নয়। ১৯৪২ এর অনেক আগে, বিশ্বযুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নি—সেই সময়েই সুভাষচন্দ্র এ ধরণের আন্দোলন চালাবার একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তাঁর

সে কথা গৃহীত হয় নি। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে এর দরুণ ভারতের স্বাধীনতা বহু দিনের মত পিছিয়ে গেল।...যাই হোক তাঁর অনুপস্থিত কালে, কংগ্রেস যখন সেই আন্দোলনের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে দিল তখন সুভাষচন্দ্র সুদূর সাগর পার হতে আন্দোলনকে ভিত্তি করে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে তাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এদিকে ভারতে সব নেতারা বন্দী হলেন। নেতৃবিহীন জনসাধারণ একটুও বিচলিত না হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সেই আন্দোলন চালাতে লাগলো। সে এক অভূতপূর্ব কাহিনী। সুভাষচন্দ্র বেতারে ঘোষণা করলেন, এই গণঅভ্যুত্থানই ভারতের মুক্তি যুদ্ধের শেষ সংগ্রাম। তিনি আরও বললেন এই সংগ্রামে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করবার জন্যে শীঘ্রই সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধোপকরণ নিয়ে তিনি হাজির হবেন ভারতের সিংহদ্বারে।

কথাটা মিথ্যা নয়, অলীক কল্পনাও নয়। ব্রিটিশের অবস্থা তখন চরম দুর্দশাগ্রস্ত। আফ্রিকার যুদ্ধে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান সেনাপতি রোমেল ব্রিটিশ বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছেন। টাকার লোভ দেখিয়ে ব্রিটিশ তখন মূর্খ দরিদ্র, ভারতীয়দের যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ভুয়ো প্রশংসা করছে। রোমেলকে ঠেকাবার জন্যে নরবলির প্রয়োজন। সেই নরবলির জন্যে মানুষ সংগ্রহ করছে ব্রিটিশ ভারতের মাটি থেকে। সুভাষচন্দ্র দেখলেন এই সুযোগ। তিনি ভারতের সাধারণ লোকদের মাঝে প্রচারকার্যের পরিবর্তে এই সৈনিকদের মধ্যে প্রচারকার্য সুরু করে দিলেন। ফলে, যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় [illegible] হাজারে হাজারে বন্দী হতে লাগলো চক্রশক্তির হাতে সুভাষচন্দ্র তাদের নিয়েই গঠন করলেন আজাদ-হিন্দ ফৌজ। হিটলার এই বাহিনীকে ভারতের মুক্তি যুদ্ধের বাহিনী বলে স্বীকার করে নিলেন। নাম দিলেন 'ফ্রীস ইণ্ডিয়েন'। এই বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ হলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। কোন অলক্ষ্যে লক্ষ কোটি নির্যাতিতের হৃদয়ে বেজে উঠলো মঙ্গল শঙ্খ। দুর্যোগের কালো রাত্রির প্রভাতের প্রথম আলোর আভাষ দেখা গেল বহু আশঙ্কার রক্তরাঙা ভারতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে। জয়তু আজাদ-হিন্দ-ফৌজ। জয়তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

তুচ্ছ লোহ প্রাচীরের ব্যবধান! আত্মার মহাশক্তিতে বলীয়ান, এ যুগের তথাগত মহামানব মহাত্মা গান্ধী আত্মার অখণ্ড শক্তি দিয়ে বরণ করে নিলেন কি তাকে?

সুভাষচন্দ্রের বিরোধী প্রচার কার্য চালাবার জন্যে বহু-নন্দিত স্যর সেকেন্দার হায়াৎ খানকে ও দেশীয় নৃপতিদের কাজে লাগালেন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু সব নিষ্ফল হল। টব্রুক বন্দরের পতনের সময় ধৃত ২৮ হাজার ভারতীয় সৈন্যের মর্মে মর্মে তখন অন্য সুর বাজছে। শতাধিক বর্ষের শৃঙ্খল বুঝি শেষবারের মতই জড়িয়ে পড়লো হাতে পায়ে। এ যেন মুক্তিরই বন্ধন!

সুভাষচন্দ্রের বাহিনীতে প্রথমে মাত্র সাত হাজার ভারতীয় যোগদান করলে। এ সংখ্যা হয়ত আধুনিক যুদ্ধে হাস্যকর। কিন্তু যে হাসি ছিল এই সাত হাজারের মুখে সে হাসি সাত লক্ষ শত্রুকে হেলায় জয় করতে পারে। এই সাত হাজার জন্ম দিতে পারে সাত কোটিকে—সেই পথেই পা ফেললো এরা।

রোমে এবং ইটালীর অন্যত্র শিক্ষাশিবির খোলা হয় এই ভারতীয় বাহিনীর জন্যে। এই বাহিনী গঠনের মূলে এই উদ্দেশ্যই ছিল যে তারা শুধু ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধেই আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, অক্ষশক্তির পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। ইটালীর এক জেনারেল ভারতীয় সেনাদের ইটালীর স্বার্থে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্যে বাধ্য করতে চেষ্টা করায় এই বাহিনী ভেঙে যায়। এদের মধ্যে অনেকে জার্মানীর হাতে বন্দী হয়। এমন কি এদের মধ্যে অনেকে যুদ্ধ থামবার পর বন্দী অবস্থাতেই মিত্রশক্তির হাতে হস্তান্তরিত হয়। সে সব খবর আলাদা।

এদিকে রাশিয়াতে জার্মানদের বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে। স্তালিনগ্রাদের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের লৌহপ্রাচীরের গায়ে আহত হয়ে হঠকারী হিটলারের দুর্ধর্ষ বাহিনী প্রথম মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। রাশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণ শুরু হল বলে। জার্মানীর গৌরবভানুর অস্ত-আলোর প্রথম গোধূলি রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তে-রক্তে চিহ্নিত হয়েছে। সুভাষচন্দ্র দেখলেন পশ্চিম সীমান্ত

দিয়ে ভারতের সিংহদ্বারে রণতূর্য আর বাজবে না। তাই তিনি পূবের পথে পা বাড়ালেন। পূবের পথ উদয়াচলের পথ।

জাপানের পূর্ব-এশিয়ায় বিজয়-অভিযানের সঙ্গে সঙ্গেই জাপান-প্রবাসী মহা-বিপ্লবী-বীর রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ বা ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ নামে একটি সঙ্ঘ সংগঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ব্যাংককে যে পূর্ব-এশিয়া-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত এই সম্মেলন চলে। এতে সব অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই অধিবেশনের আগে টোকিওতে এই ধরণের একটা অধিবেশন হয়েছিল। যাই হোক এই ব্যাংকক সম্মেলনেই আজাদ-হিন্দ-ফৌজের প্রথম সূত্রপাত। এই সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত হন রাসবিহারী বসু এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধ্যক্ষ হলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সত্যিকারের কার্যকরী হয়ে উঠেছিল বটে কিন্তু আসলে মোহন সিংই এই বাহিনীর প্রথম সংগঠক। মোহন সিং মাত্র ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। এই বাহিনী, গান্ধী ফৌজ, নেহরু ফৌজ ও আজাদ ফৌজ এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। এদের পতাকা ছিল কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা। উদ্দেশ্য ছিল—মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে অভিযান চালিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

জাপান প্রথমে ভারতের এই স্বাধীন-অভিযানে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু পরে দেখা গেল কার্যত জাপান নিজে স্বার্থের জন্যেই এই বাহিনীকে কাজে লাগাতে চায়। ফলে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে জেনারেল ইয়াকুয়ার মতবিরোধ হল। এবং আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ভেঙে যাবার উপক্রম হল। এই সময়ে—১৯৪২ সালের শেষভাগে, রাসবিহারী বসু টেলিফোনযোগে বার্লিনস্থ সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের মধ্যে কি সব কথা হয়েছিল তা জানা নেই, তবে তার পরেই সুভাষচন্দ্র পূর্ব-এশিয়ার দিকে যাত্রা করেন। যাবার সময় তিনি ইউরোপের আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভার এক মালাবারবাসীর হাতে দিয়ে আসেন।

বার্লিন থেকে টোকিও যাত্রাকাহিনী ভারতত্যাগের কাহিনী অপেক্ষা আরও চমকপ্রদ, আরও রোমাঞ্চকর। জার্মানীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। জাপানের সমুদ্রএলাকাও প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে আসছে এমনি সময়েই অসীম দুঃসাহসী সুভাষচন্দ্র সাবমেরিন বা ডুব জাহাজযোগে টোকিও যাত্রা করলেন। এই ডুবো জাহাজের সন্ধান পেয়ে চারদিক থেকে জলপথে ও আকাশপথে মিত্রশক্তির আক্রমণ চলতে লাগলো। পদে পদে বিপদ এড়িয়ে চারমাস পর সুভাষচন্দ্র টোকিও পৌছলেন। সেখানে জেনারেল তোজোর সঙ্গে তাঁর পরামর্শ-আলোচনাদি হয়। এবং সেই আলোচনা অনুযায়ীই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে এসে ২রা জুলাই ১৯৪৩ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। সেদিনই মিত্রশক্তির ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠলো। কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্রভরা সেই কালো মেঘ! কিছুদিন পর আগষ্ট মাসে তিনি শ্যাম রাজ্যের (১৯৩৯ সালে পণ্ডিত জওহরলাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘটিকেও সেই সঙ্গে এক করে নিলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বভার গ্রহণের ফলে পূর্বতন ভারতীয় স্বাধীনতাসঙ্ঘ ও জাপানী সমর-বিভাগের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বিবাদ চলছিল তার অবসান হল। ৫০ হাজার সৈন্ত ও ১৫০০ সেনানায়ক নিয়ে নেতাজী তাঁর কাজ সুরু করে দিলেন। প্রত্যেকে এই মর্মে শপথ করলেন—এতদ্বারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং আমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করছি। আমি শুদ্ধ ও অকপট চিত্তে ভারতমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করছি এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্তে আমার জীবন পণ করছি। আমি ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধে আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহায্য করবো এবং তার জন্তে আমার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেবো। আমার দেশের সেবা করতে প্রতিদানে কিছু চাইবো না। ভারতের নরনারীকে নিজের ভ্রাতা ও ভগ্নি মনে করবো—ধর্ম, ভাষা বা বাসস্থান নিয়ে কোনরকম ভেদজ্ঞান করবো না।

এই বছরেই ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র

সামরিক ভাবে গঠিত ও জগৎসমক্ষে প্রচারিত হয়। অক্ষশক্তি একে স্বীকার করে নেয়। এই সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজী এক ঘোষণাপত্র বার করেন। এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের কর্মকর্তাদের নাম—

১। শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু—রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সমরসচিব, পররাষ্ট্র সচিব, আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক।

২। মিঃ এস, এ, আয়ার—প্রচার ও আন্দোলন সচিব।

৩। ক্যাপ্টেন শ্রীমতী লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী সংগঠন।

৪। লেঃ কর্ণেল এ সি, চ্যাটার্জী—অর্থ-সচিব।

৫। শ্রীআনন্দমোহন সহায়—কর্ম সচিব।

৬। শ্রীরাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা।

৭। মিঃ এন এন সরকার—আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা।

করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি, এম, খান, এ, ন, আয়া, জে থিবি ও সর্দার ঈশ্বর সিংহকে নিয়ে পরামর্শদাতা সভা সংগঠিত হয়। তাছাড়া সমর সংসদ সংগঠিত হয় এঁদের নিয়ে—লেঃ কঃ আজিজ আমেদ, লেঃ কঃ এন, এস, ভগৎ, কঃ জে, কে, ভোঁসলে, লেঃ কঃ গুলজার সিং, লেঃ কঃ এম, জে, কিয়ানী, লেঃ কঃ লোকনাথন, লেঃ কঃ এসান কাদির এবং লেঃ কঃ শাহ নওয়াজ।

এই সামরিক আজাদ হিন্দ সরকার পক্ষ থেকে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত সকল দেশে দূত পাঠানো হল। আর আভ্যন্তরিক শাসনব্যবস্থার জন্য ১১টি বিভাগ খোলা হল। জাপ সরকার এঁদের হাতে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অর্পণ করলেন। এই প্রসঙ্গে নেতাজী বলেছিলেন—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয়দের হাতে সমর্পিত হল। এই ভূখণ্ডই ব্রিটিশ কবল থেকে প্রথম মুক্ত হল। এর ফলেই আজাদ হিন্দ সরকার কার্যত একটা বাস্তব অধিকার লাভ করতে পারলো। আন্দামানের মুক্তির অন্তরালে একটা রূপক ইঙ্গিতও আছে। ব্রিটিশ জাতি এই আন্দামানকে রাজবন্দীদের নির্বাসনস্থানরূপে ব্যবহার করে আসছে। ব্রিটিশ সরকারের

উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টার ফলে যারা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছে তাদের অধিকাংশকেই এই কারাগারে থাকতে হয়েছে। ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্রথমে যেমন প্যারিসের ব্যাষ্টিল থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা হয়েছিল তেমনি ভারতের মুক্তিসংগ্রামেও সর্বপ্রথম আন্দামানকে মুক্ত করা হল। ক্রমে পরপর ভারতের সব অঞ্চলই স্বাধীন হবে। কিন্তু প্রথম যে অংশ মুক্ত হল তার একটা গুরুত্ব আছে। আমাদের শহীদদের স্মৃতিতে আমরা আন্দামান দ্বীপের নাম শহীদ দ্বীপ এবং নিকোবর দ্বীপের নাম স্বরাজ দ্বীপ রাখছি।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজ সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হয় ১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। এই সময়ে জাপানী সেনারা হুকুয়াং উপত্যকায় ইঙ্গ-মার্কিন সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল হুকুয়াংএর যুদ্ধের পর ইম্ফল সরাসরি আক্রমণ করা। এবং ইম্ফল অধিকৃত হবার পরে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যে আরও অগ্রসর হবে। অপরদিকে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের আদর্শ স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনমত জাপানীদের সাহায্য গ্রহণ করা। জাপানীদের ভিন্ন সঙ্কল্পের কথা জানতে পেরে নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজকে সিঙ্গাপুর থেকে ৭ই জানুয়ারী রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করলেন এবং সেখানে ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী বা ম'র অধীনস্থ জাতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সরাসরি যুদ্ধের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজ ইম্ফল আক্রমণ করলো এবং ১৮ই মার্চ ব্রহ্মসীমা অতিক্রম করে ভারতভূমিতে এসে পদার্পণ করলো। এই বাহিনীতে যথাক্রমে শাহ নওয়াজ, ইনায়েৎ কিয়ানি, জনমার সিং, গুরবক্স সিং ও লক্ষ্মী স্বামীনাথনের পরিচালনাধীনে সুভাষ রেজিমেন্ট, গান্ধী রেজিমেন্ট, আজাদ রেজিমেন্ট, নেহরু রেজিমেন্ট, ও রাণী ঝাঁসী রেজিমেন্ট যুদ্ধ করছিল। প্রথম যুদ্ধেই ভারতীয় সেনারা অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলো। মোরাই, কোহিমা প্রভৃতি গ্রাম অধিকৃত হল। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত। মুক্তি যুদ্ধের পবিত্র বহ্নিতে শুদ্ধ আজাদী সেনারা ভারতের স্বর্ণভূমিতে শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, কৃতজ্ঞতায় সাষ্টাঙ্গে

লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলো। মুঠো মুঠো করে তুলে নিয়ে সোনার মাটি মাথায় ঠেকালো। মাটিতে লুটিয়ে চুম্বন করলো ভারতের রক্তপ্রসূ অঙ্গে। বীর সেনাপতি শাহ নওয়াজ সব্যসাচীর মত এগিয়ে এসে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন সবার মাঝখানে। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতীয়েরা আকাশ কাঁপিয়ে প্রাণভরে জয়গান করলো স্বাধীন ভারতের···। জয় হিন্দ! বন্দেমাতরম!···ঐ নদী··· ঐ জঙ্গল—ঐ পর্বতমালার অপর পারে যেখানে চল্লিশকোটি শৃঙ্খলিত মানুষ দুর্যোগের রাত্রি প্রভাতের উদয়তীর্থপানে প্রত্যাশী চোখে বসে আছে নিশি জেগে সেই হতবাক হতচেতন ভারতবাসীর কাণে সে জয়ধ্বনি পৌছলো কি?

যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে। বিভীষিকাময় চরম বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে ইঙ্গ মার্কিণ সেনাদের ভাগ্যাকাশে। জাপানীরা যদি এই সময়ে তাদের প্রতিশ্রুতিমত সাহায্য পাঠায় তাহলে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদের আর রক্ষা নেই। কিন্তু সাহায্য এল না। যুদ্ধক্ষেত্রের পার্বত্যভূমিতে বর্ষা নেমে গেছে তখন। সেই দুর্দান্ত বর্ষায় কোনরকম সাহায্য পাঠাবার উপায় নেই স্থলপথে। বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় সেনারা। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, রসদ নেই, অস্ত্র নেই, ওষুধ নেই তবু সর্বশক্তি পণ করে যুদ্ধ নিয়ে লড়ছে আজাদী সেনারা। বিমানপথে শত্রুরা অজস্র রসদ আনাচ্ছে। চতুর্দিকে অন্ধের মত বেপরোয়া বোমাবর্ষণ চালিয়েছে। বিমানের অভাবে বোমাবর্ষণের প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। কৃতঘ্ন জাপান নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছে আজাদী সেনাদের।···নেতাজীর বাণী মনে পড়ছে—আপাততঃ তোমাদের দুঃখ, কষ্ট, অনাহার ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবো না।···কিন্তু কিন্তু তুমি যদি রক্ত দাও তাহলে আমি তোমায় স্বাধীনতা এনে দেবো···নষ্ট করবার মত সময় নেই··· ওঠ, হাতিয়ার নাও···সম্মুখে ঐ পথ···দিল্লীর পথ, স্বাধীনতার পথ···চলো দিল্লী···

হাজার হাজার মুক্তি-কামী বীরের শেষ নিশ্বাস শোনা যাচ্ছে···শেষ কণ্ঠস্বর··· নেতাজী আমি রক্ত দিয়েছি···আমার দেহের রক্তরাঙা পথে ভারতের স্বাধীনতা আসবে।···

অসীম উদ্যোগে নেতাজী এই সামরিক অসাফল্যেও দমে গেলেন না। এই বিপর্যয়ের মধ্য থেকেই তিনি নব উদ্যমের অনুপ্রেরণা খুঁজে পেলেন। তিনি বলেছিলেন, এই যুদ্ধ হতে আমরা কি শিক্ষা করলুম? আমরা এই যুদ্ধে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করেছি।...অসামরিক কার্যে পূর্ব-নিযুক্ত একদল সেনাকে পিছু হটবার আদেশ দেওয়া হয়। সেই সময় তাদের রণসম্ভার প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল কিন্তু তবু তারা পিছু হটে আসতে রাজী হল না। সঙীন নিয়ে শত্রুর উপর চড়াও হল এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে এল।...এই যুদ্ধে আমাদের সৈন্যদের বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। আমরা শুনছি যে ভারতীয় সৈন্যরা (ব্রিটিশের অন্তর্ভুক্ত) আমাদের দিকে আসতে প্রস্তুত। আমরা শত্রুদের কলকৌশল জানতে পেরেছি। সংগ্রাম আরম্ভ হবার আগে থেকেই জাপানীরা আমাদের বিশ্বাস করতো না।... আমাদের ত্রুটি কোথায় তা-ও আমরা বুঝতে পেরেছি। তন্নাই অঞ্চলটা অত্যন্ত দুর্গম। যানবাহন এবং রণসম্ভার সরবরাহের নিদারুণ অসুবিধা ঘটেছিল। রণক্ষেত্রে আমাদের প্রচারকার্যের ব্যবস্থাও ছিল না।...জাপানীরা আমাদের কয়েকটা লাউড স্পীকারও দেয় নি।

রণক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে পরিভ্রমণ করে নেতাজী সৈন্যদের উৎসাহিত করে বেড়াতে লাগলেন। সময়টা হল ১৯৪০ সালের মে-জুন মাস। তিনি বলেন, ভারতের মাটিতে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ আমাদের নিজেদের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধ আমাদের নিজেদের যুদ্ধ—এই ধারণার ফলে শুধু যে সম্মুখ-যুদ্ধে যারা নিযুক্ত আছে তাদের মনেই একটা জাগরণের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছে তা নয়, যারা পিছনে থেকে এই যুদ্ধে সহায়তা করেছে তাদের মনেও অপরিসীম উৎসাহের প্রেরণা দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি আমি একটা হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম। তারা সকলেই আমাকে অনুনয় জানায় যে সুস্থ হয়ে উঠবামাত্রই তাদের যেন রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি বলতে পারি যে, পূর্ব-এশিয়ার সমগ্র ভারতীয়দেরই এই রকম মনোভাব।

এই সময়ে খবর পাওয়া গেল যে গান্ধীজীকে ভারত সরকার স্বাস্থ্যের অজুহাতে

জেল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নেতাজী এই সম্পর্কে বলেন,—কিছুকাল আগে মহাত্মা গান্ধী যখন অকস্মাৎ মুক্তিলাভ করলেন তখন স্বভাবতই লোকের মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল যে, নেহাৎ স্বাস্থের খাতিরে মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি, এটা একটা আপোষের পূর্ব সূচনা। এখন জানা গিয়াছে নিতান্ত স্বাস্থ্যের খাতিরেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এর পেছনে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই। আমাদের পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহের কথা এই যে, মহাত্মা গান্ধী এপর্যন্ত যে সমস্ত বিবৃতি দিয়েছেন তার সব কয়টির মধ্যেই এক কথা রয়েছে যে দু'বছর আগে তিনি ইংরাজ ভারত ছাড়' এই মর্মে যে প্রস্তাব করে ছিলেন তার পরিবর্তনের কোন কারণ তিনি দেখেন না।

'মহাত্মাজী শুধু মুখের কথায় যে ভারতবাসীরা কত আস্থাহীন সে কথা আপনি সকলের চেয়ে ভাল জানেন। আমি যদি মনে করতাম যে জাপানের প্রতিশ্রুতি শুধু মুখের তাহলে তাদের কথায় আমি প্রভাবান্বিত কখনই হতাম না!

'আমাদের স্বদেশবাসী লোকেরা যদি কোনরকমে নিজেদের চেষ্টায় ভারতবর্ষকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে বা ঘটনাচক্রে ইংরাজরা যদি আপনার 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করে তাহলে আমরা খুবই আনন্দিত হব। কিন্তু এই দু'টির একটিও সম্ভব নয়, এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না—এই ধারণা নিয়েই ভারতের স্বাধীনতার জন্যে আমরা যে সংগ্রাম সুরু করেছি ইংরাজরা নিঃশেষে ভারত থেকে বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত তা থামবে না। দিল্লীতে রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদে জাতীয় পতাকা সগর্বে উড্ডীন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলতে থাকবে।

'আমাদের জাতির পিতা ভারতের স্বাধীনতার এই পবিত্র সংগ্রামে আমরা আপনার আশীষ এবং শুভেচ্ছা চাইছি।

'একটা কথার উত্তর দেওয়া আমি প্রয়োজন বোধ করি। আমি কি চক্র শক্তির হাতে প্রবঞ্চিত হয়েছি? যারা একবার ইংরাজ রাজনীতিকদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে পৃথিবীর অন্য কোন রাজনীতিক তাদের প্রবঞ্চিত

করতে পারবে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে আমি দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেছি, নির্যাতন সহ্য করেছি দৈহিক অত্যাচারও সহ্য করেছি। সেই সবই যখন আমাকে দমন করতে পারে নি, তখন পৃথিবীর অন্য কোন শক্তি পারবে বলে মনে করি না। আমি কখনও এমন কোন কাজ করি নি যাতে আমার দেশের সম্মান বা স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে।

এদিকে যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে চলেছে। নেতাজী প্রত্যক্ষ রণক্ষেত্রে সৈন্যদের উৎসাহ দিচ্ছেন বটে কিন্তু সকলক্ষেত্রে ঠিক কার্যকরী হচ্ছে না। অনেক সৈন্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবনপণ করে শুধু মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়ছে। অনেকে আবার অভাব ও দুর্দশার চাপে শত্রুপক্ষে ভিড়ে পরেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রভাগে পতাকাধারী সৈন্যেরা একখানা বড় ব্যাজে—'আমাদের সঙ্গে যোগ দাও, এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ কর'—এই কথা লিখে দিয়ে যেতো। অপরদিক থেকে পাল্টা জবাব দেখা যেতো—'তোমরা জাপানের ক্রীতদাস! তোমাদের খাদ্য নেই। আমাদের দিকে এসো পেট ভরে খেতে পাবে। সঙ্গে সঙ্গে আজাদ ফৌজ জবাব দিত—আমরা জাপানের ক্রীতদাস নই। আমরা নেতাজীর আদেশে যুদ্ধ করছি। খাবার কথা বলছো? স্বাধীন থেকে ঘাস খাওয়া ভাল, তবুও দাসত্ব করে ঘি আটা খেতে আমরা চাই না।'

কিন্তু নিষ্ঠুর হলেও একথা সত্যি যে শেষ পর্যন্ত ঘাস খেয়ে না থাকতে পেরে অনেকেই শত্রুপক্ষে গিয়ে যোগ দিতে লাগলো। অগত্যা ২১শে আগষ্ট নেতাজীর আদেশমত যুদ্ধ স্থগিত রাখা হল। তারপর নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজের ৭৫টি শাখা থেকে ১৮০ জন প্রতিনিধি নিয়ে এক সম্মেলন ডাকলেন। এই সম্মেলনে পরবর্তী কার্যপদ্ধতি এবং রণকৌশল সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা পরামর্শাদি হল।

নেতাজী বললেন, ভারত মাতার সন্তানেরা সৈনিকরূপে সমর ক্ষেত্রে গিয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা দেবী এখনও প্রসন্না হন নাই। কি করলে যে তিনি প্রসন্ন হবেন সে গোপন কথা আমি তোমাদের বলবো। আজ তিনি শুধু ফৌজের জন্য সৈনিক চান না। তিনি চান বিদ্রোহী, বিদ্রোহী

নয়, বিদ্রোহিনী নারী—যারা মৃত্যুকে শঙ্কা করে না—মৃত্যুকে সুনিশ্চিত জেনে 'রেজাহান ফৌজ' গঠনে যারা প্রস্তুত—স্বাধীনতা দেবী চান এখন বিপ্লবী। বিপ্লবিনী যারা নিজেদের রক্ত নদীতে শত্রুদের ডুবিয়ে মারতে পারবে—

কথা শুনে এগিয়ে এলো হাজার হাজার দৃপ্ত বুক, যে বুকের পশ্চাতে লুকিয়ে আছে রক্ত নদীর অফুরান উৎসের মত হাজার হাজার হৃৎপিণ্ড—!

নেতাজী বললেন মরণের সঙ্গে চুক্তি করবে যে দলিলে তাতে সাধারণ কালিতে স্বাক্ষর দেওয়া চলবে না। নিজেদের রক্তে স্বাক্ষর দিতে হবে। যাদের সাহস আছে, তারা এগিয়ে এসো, মাতৃভূমির মুক্তি দলিলে তোমাদের স্বাক্ষরের সাক্ষী আমি থাকবো—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল লেখনীর বদলে হাজার হাজার উদ্ধত ও উন্মুখ কাটা আঙুলে রক্ত ঝরছে কালি হয়ে।

আবার আক্রমণ শুরু হল। ওদিকে সুসজ্জিত ও বর্ধিত শক্তি ইঙ্গ মার্কিন বাহিনীও আরও প্রচণ্ডভাবে প্রতিআক্রমণ সুরু করে দিলে। আজাদ ফৌজ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু এদিকে দলের মধ্যে ভাঙন সুরু হয়ে গেছে আবার। চতুর্দিকে বিভীষণরা মাথা তুলে উঠেছে। ক্যাপ্টেন মহম্মদ হোসেন, লেঃ ইরানিন, লেঃ সাদিক লেঃ গরীব সিং, বাজি শাহ্ প্রভৃতি সেনানায়কগণ তাঁদের দলবল সহ শত্রুপক্ষে গিয়ে যোগ দিয়েছেন। খাদ্য বস্ত্র ও দৈহিক আরাম দেশপ্রেমের চেয়ে বড় প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে তাঁদের মনে।

১৯৪৪ সালে ২০শে অক্টোবর জাপানীরা টিডিম ছেড়ে এল। ২৬শে ডিসেম্বর ইংরাজ সৈন্য বুথিডং দখল করলে। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ইংরাজ সৈন্য আকিয়াবে অবতরণ করলে।

আজাদ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে, খণ্ড খণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। কিন্তু তবু তারা লড়ছে, মুক্তি-কামী বীর নির্ভিক শহীদের দল—বেজাহান বাহিনীর রক্ষ—স্বাধীনতাকামী মানুষ—আগুনেরা। কিন্তু এ মরণের খণ্ডযুদ্ধে লাভ নেই। কারণ জাপানের রাজ-বাহিনীরাই যখন পিছিয়ে পড়েছে তখন এই মুষ্টিমেয় সৈন্য

কিছু বেশী কিছু প্রত্যাশা করা অন্যায়। সুতরাং নেতাজী আবার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন যুদ্ধ স্থগিত রাখবার জন্যে। কিন্তু মৃত্যুপণ করে যারা লড়ছে তারা এই আদেশ বিশ্বাস করতে পারলো না। তাদের ধারণা হল সেনানায়করা হয়তো বিশ্বাসঘাতকতা করে এই কথা বলছেন। অগত্যা নেতাজী নিজের হাতে এই আদেশ লিখে পাঠালেন। তখন এদের বিশ্বাস হল। শেষ বিশ্বাস হারাবার বিশ্বাস!

এদিকে জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করবার তোড়জোড় করছে। ২৩শে এপ্রিল সত্যি-সত্যিই জাপ অধিনায়ক রেঙ্গুন ত্যাগ করলেন। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য মেঘাবৃত আকাশেই বুঝি অস্ত যাচ্ছে—! পশ্চিমের আকাশ বড় লাল, বড় বেশী লাল, তাই মেঘে মেঘেও ঘন লাল ছোপ পড়েছে। কোথাও বুঝি আগুন লাগলো কিংবা কোথাও বুঝি আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে।

২৪শে এপ্রিল নেতাজী ঝাঁসী বাহিনীর ৬০ জন ও অন্যান্য সঙ্গী সমেত মোট ১০০ জন সহকারীকে নিয়ে রেঙ্গুন থেকে ব্যাংকক যাত্রা করলেন। যাবার আগে জেনারেল লোকনাথনের অধীনে সাত হাজার সৈন্য রেখে গেলেন। এরা যুদ্ধ করবার জন্যে রইলো না, এরা রইলো ইংরেজের রেঙ্গুন অধিকারের পর জনসাধারণের ধনসম্পত্তি রক্ষা প্রভৃতি কাজে সাহায্য করবার জন্যে। ইংরাজ-অধিনায়ক লড়াই এদের এই ভাবে নিযুক্ত রাখেন এবং এদের সকলকে ভারতে পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে অবশ্য ইংরাজরা আজাদ-হিন্দের ব্যাংক আক্রমণ করে ত্রিশ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে এবং শ্রীযুত ভাদুড়ীকে গ্রেপ্তার করে।

একমাত্র প্রোম অঞ্চলে শাহ নওয়াজ খান তখনও আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি তাঁর অধীনস্থ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর সৈন্য শিবিরে বিদ্রোহ দেখা যায়। সেনা-নায়করা পালাতে আরম্ভ করেন। একজন সিপাই কর্ণেল ধীলনকে গুলি পর্যন্ত করে বসেন। অবশ্য তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪১ জন অনুচর নিয়ে শাহ নওয়াজ নিজের সম্মান অটুট রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ১৭ই-র তারিখে

তিনি হঠাৎ বন্দী হন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর মুক্তি-সংগ্রামের শেষ যবনিকা পড়ে।

রেঙ্গুন ত্যাগ করবার আগে নেতাজী বলেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানায়ক এবং সৈনিকবৃন্দ! ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে তোমরা বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছো এবং করছো কিন্তু বহু দুঃখ নিয়ে আমি ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে আমরা ইম্ফল এবং ব্রহ্মদেশে পরাজিত হয়েছি। এটা আমাদের প্রথম পর্যায় মাত্র। আমাদের আরও অনেক পর্যায়ে যুদ্ধ করতে হবে। আমি জন্ম হতে আত্মবিশ্বাসী। পরাজয়কে কোনক্রমে আমি স্বীকার করে নেবোনা।…তোমাদের অপরিমেয় ত্যাগের ফলে ভবিষ্যৎ ভারত সন্তানগণ ক্রীতদাস হয়ে জন্মগ্রহণ না করে স্বাধীন মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করবে।… তোমরা শেষ পর্যন্ত জয় এবং গৌরবের পথ প্রস্তুত করে রেখে গিয়েছো। ভারতের স্বাধীনতার উপর আমার অটল বিশ্বাস বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নাই। আমি তোমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, আমাদের জাতীয় সম্মান এবং ভারতীয় যোদ্ধাদের অক্ষয় মর্যাদা নিরাপদে রক্ষা করবার ভার তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি।…১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে আমি শপথ গ্রহণ করেছিলুম যে, ৩৮ কোটি স্বদেশবাসীর স্বার্থের জন্যে এবং তাদের মুক্তির জন্যে আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করবো। আমার সেই শপথ থেকে আমি বিচ্যুত হব না। সর্বশেষে তোমাদের কাছে আমার আবেদন এই যে, আমি বিশ্বাস পোষণ করি তোমরাও আমার মত সেই বিশ্বাস চিরকাল রাখো যে, চিরকালই অন্ধকারময় রাত্রির শেষে নূতন প্রভাতের অভ্যুদয় হয়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবেই, খুব শীঘ্রই স্বাধীন হবে।

রেঙ্গুন থেকে ব্যাংককে পৌঁছতে ১৫ দিন লাগলো। অতি বিঘ্ন-বিপদ-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করে আসতে হল তাঁদেরকে। নেতাজীর আশা ছিল এখান থেকে জাপানী সমর-নায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার নূতন কর্মপন্থার উদ্ভাবন করতে হবে। কিন্তু এদিকে জাপ সম্রাট হিরোহিতো ইঙ্গ-মার্কিনের কাছে ১৫ই আগষ্ট আত্মসমর্পণ করবেন বলে সময় করলেন। নেতাজী ব্যর্থ হলেন। এখনও তাঁর

পক্ষেও আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ইংরেজের হাতে বন্দী হওয়া মানে তাঁর সমস্ত আদর্শের সমাধি, তাঁর সমস্ত সাধনার পরিসমাপ্তি। তাঁর পক্ষে এই পরিণাম অচিন্তনীয়, অসম্ভব। তাই তিনি স্থির করলেন রাশিয়ার কাছেই ধরা দেবেন, যদি একান্তই ধরা দিতে হয়। তিনি জানেন এবং বরাবরই বিশ্বাস করেন যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে যদি সত্যিকারের সাহায্যকারী বন্ধু কেউ থাকে ত' সে রাশিয়া। যদিও যুদ্ধের পাকচক্রে রাশিয়া আজ ইংরাজের বন্ধু তবু এই মিত্রতা যে সাময়িক ও একান্ত মৌখিক তা তিনি জানতেন। এদিকে রাশিয়ান সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করেছে এবং জাপ-সৈন্যদের নিরস্ত্র করে ফেলছে। সুতরাং নেতাজী স্থির করলেন মাঞ্চুরিয়াতে গিয়ে তিনি রাশিয়ানদের সঙ্গে হাত মেলাবেন।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট নেতাজী আজাদ-হিন্দ সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী এবং কয়েকজন জাপানী সেনানায়ক সহ তিনখানি বিমানযোগে মাঞ্চুরিয়া যাত্রা করলেন। পথে ফরমোসা দ্বীপে তাইহকু বিমানক্ষেত্রে বিমান তিনখানি বিশ্রামের জন্য থামে। তারপর আবার যাত্রা করলে নেতাজী ও তাঁর সহকারী হাবিবুর রহমান যে বিমানখানিতে ছিলেন তার কলকজা বিগড়ে যায় এবং পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে আগুন ধরে গিয়ে বিমানখানি মাটিতে এসে পড়ে। আগুনে নেতাজী সাংঘাতিক ভাবে দগ্ধ হন। হাবিবুর রহমানও আহত হন। দুজনকে দুটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল। হাসপাতালে যাবার আগে নেতাজী হাবিবুর রহমানকে বলেন, হাবিব, আমার দেশবাসীদের বলো যে আমার দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে আমি প্রাণ দিলাম। অতি শীঘ্রই আমার দেশ স্বাধীনতা লাভ করবে এই পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই আমি প্রাণত্যাগ করবো।

কয়েকদিন বাবার পরে হাবিবুর রহমান খানিকটা সুস্থ হলে অপর হাসপাতালে তিনি নেতাজীর খোঁজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে ডাক্তারের কাছে শোনেন যে নেতাজীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হয়ে গেছে, ভগ্ন মনোরথ হাবিবুর রহমান নেতাজীর দেহের চিতাভস্ম সঙ্গে নিয়ে টোকিও যাত্রা করলেন।

২৩শে আগষ্ট জাপ-সরকার মারফৎ ঘোষণা করা হল যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে।

ইতিপূর্বে টোকিও রেডিও থেকে বার দুয়েক নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হয়েছে এবং প্রতিবারেই সেই সংবাদের অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাই এই সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ করবার কারণ আছে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে হাবিবুর রহমান যা বলছেন সবই তাঁর শোনা কথা, নেতাজীর সঙ্গে তিনি এক হাসপাতালে ছিলেন না। তার থেকেও বড় কথা এই —তিনি লোকের চোখে ধূলো দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই যে সাজানো গল্প বলছেন না তারই বা প্রমাণ কি?

নেতাজী আপনার আমার ভীড়ের মাঝখান থেকেই আবার দেখা দেবেন না একথাই বা অবিশ্বাস করি কেমন করে? তাই পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে পাশের লোকটিকে দেখে গুজব রটতে দেরী হয় না। আশে-পাশে সবার মাঝেই ত সূর্যোদয় হচ্ছে!

নবযুগের অরুণোদয়

[১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে কোনো উত্তর জার্মান স্টেশন থেকে আজাদ হিন্দ বেতারে প্রচারিত বক্তৃতা]

"কিছুকাল ধ'রে আমি ধীর ও শান্তভাবে পৃথিবীর পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। সিংগাপুরের পতন বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বাভাস মাত্র। এক নবযুগের জন্ম হ'চ্ছে। আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত ক'রে বৃটিশরা ভেঙে দিয়েছে আমাদের নৈতিক মনোবল, ধ্বংস করেছে আমাদের আর্থিক শক্তি। আজ ভারতকে মুক্ত করার যে শুভ মুহূর্ত ভগবান আমাদের দিয়েছেন, সেজন্যে তাঁকে আমরা প্রণাম জানাই। আজকের দিনে বৃটেনের মতো স্বাধীনতা ও প্রগতির বড়ো শত্রু আর নেই। তাই বৃটিশ-শাসনের ধ্বংসের অর্থ হলো ভারতের ইতিহাসে অত্যাচারময় এক স্বৈরশাসনের পরিসমাপ্তি এবং নতুন জীবনের জন্ম। আমাদের উপর বৃটিশেরা অপমান ও হীনতার গ্লানি স্তূপীকৃত ক'রে দিয়েছে। ভগবান আমাদের এই যে শুভ সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্যে তাঁকে আবার ধন্যবাদ জানাই। আজ পৃথিবীর বহু জাতিই বৃটেনের শত্রু।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জাতির পথপ্রদর্শক ব'লে দাবী করেন। কিন্তু তাঁদের উত্তরহীন ব্যবস্থাগুলি বৃটিশ শাসনের কর্ণধারদেরকে তাদের সেই অতি প্রাচীন পরিচিত পথে চলতে উৎসাহিত করেছে মাত্র। এই পথ হোলো, যে-অংগীকার পূরণের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই, সেই অংগীকারগুলি বারে বারে করা। আর আমি এ-ও জানি, ভারতে এমন লোকও আছেন, যাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যে উদ্গ্রীব। কিন্তু অধিকাংশ ভারতবাসীই বৃটিশ শাসন বা বৃটিশের প্রবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চান না। যতোদিন ভারতমাতৃকার মুক্তি না হয় ততোদিন আমাদের এই যুদ্ধের বিরাম নেই।

[illegible] নিয়ে এই সমস্যার সমাধানের [illegible]। যে কোনো শক্তিকারে জোরজবরদস্তি করবেন, তাঁর নিজের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিবেন। যে দেশ, যে জাতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুসম্পন্ন করার জন্যে সাহায্য করবে, আমরা তাদেরই সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমি আশা করি, বৃটিশের বিরুদ্ধে আমার এই যুদ্ধে ভারতীয় ভাই বোনেরা আমাকে সাহায্য করবেন। সমস্ত ষড়যন্ত্র ও ধূর্ততা নিয়েও আজ বৃটেন আর ভারতকে প্রতারিত করতে পারবে না—পারবে না তাদের মহাজাতীয়তার আদর্শ থেকে তাদের বঞ্চিত-বিরত করতে। ভারত স্থির করেছে, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবে। সে শুধু নিজেকে স্বাধীন করবে না, স্বাধীন করবে এশিয়াকে, স্বাধীন করবে সারা দুনিয়াকে!

[১৯৪২ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে বের্লিনবেতারে প্রচারিত বক্তৃতা।]

'বোনেরা ও ভাইএরা!' সিংগাপুরের দ্বীপ-দুর্গের পতনের পর সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ ও তার মিত্র সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্গগুলি দ্রুত আত্মসমর্পণ করছে। রেংগুনের পতন হয়েছে। সেই পুরাতন দিনে, যখন ঐশ্বর্যে ব্রহ্মের সুবৃহৎ শ্যামল শস্যক্ষেত্রগুলি হাসতো, ঝলমল করতো তার সুবর্ণ-বর্ণ প্রাসাদ ও প্যাগোডাগুলি, সেদিন ব্রহ্মের জনসাধারণ যেমনটি ক'রে মুক্তির সানন্দ নিঃশ্বাস নিতো, আজ আবার তারা নিচ্ছে তেমনি ক'রে। ১৯৪১ সালের ২৬শে নভেম্বর জার্মানির বৈদেশিক মন্ত্রী যা ব'লেছিলেন, আজ তা ভবিষ্যৎবাণীর মতো সফল হ'য়েছে। একের পর এক বৃটেন তার ঘাঁটিগুলি হারাচ্ছে। যতোদূর মানুষের দৃষ্টি চলে, তার মধ্যে এমন কিছু দেখা যাচ্ছে না যা বিপুল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙন ও ধ্বংসের প্রতিরোধ করতে পারে। বৃটেন তার চিরকালীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুবর্তন ক'রে, এই যুদ্ধের শুরু থেকেই চাইছে যে অন্যান্য দেশ ও জাতিগুলি তার হয়ে তার যুদ্ধগুলি করুক এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণ তারা যোগাক। কিন্তু সে-কৌশল এবার সফল হয়নি। তাই বৃটেন আজ কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে তার সমস্ত বড়ো যুদ্ধগুলিতেই পরাজিত হ'য়েছে।

"ভারতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতি কার্যে পরিণত ক'রে বৃটিশ সরকারকে

তাঁর সহকর্মীদের অনেককে [illegible] করার মতো ভারতের জনসাধারণ [illegible] সেন্টারের বাস থেকে অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে চলেছে। এমন কি কয়েকজন জাতীয়তাবাদী এতোদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, বৃটিশ যদি ভারতের জাতীয় দাবী পূরণ করে, তবে তাঁরা বৃটেনের এই যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্যও করবেন। কিন্তু বৃটেনের দিক থেকে তার একমাত্র জবাব এসেছে : তাদের অনিচ্ছা ; স্পষ্ট ও রূঢ় ভাষায় নয়,—যা আমরা বেশি পছন্দ করতাম—এসেছে বিশ্বাসহীন মিথ্যার চটুল চাতুর্যে। ভারত শাসনের সুদীর্ঘ কাল ধ'রে বৃটিশ চেষ্টা করেছে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ ও মতদ্বৈধের সৃষ্টি করতে। আজ তারা এই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত বিরোধ ও মতদ্বৈধকেই ব্যবহার করছে ভারতকে তার আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অজুহাতরূপে। কিন্তু এই মিথ্যা ভাষণ করেও তারা সন্তুষ্ট হয় নি। বৃটিশ প্রচারকারীরা ভারতের জনসাধারণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, ভারতবর্ষ শত্রু আক্রমণে বিপন্ন হতে চলেছে, সুতরাং ভারতের সীমান্ত আজ প্রসারিত হ'য়েছে একদিকে হংকং আর অন্যদিকে সুয়েজ পর্যন্ত। এই অজুহাতে ভারতীয় সৈন্যদের ভারতীয় জনসাধারণের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে পাঠানো হচ্ছে পশ্চিমে লিবিয়ায় আর ফ্রান্সে, এবং পূর্বে হংকং ও সিংগাপুরে। কিন্তু বস্তুত, ভারতের এমন কোনো কল্পিত [illegible] সীমান্ত নেই। তার ভৌগোলিক সীমান্ত নির্দিষ্ট হ'য়েছে বিধাতা ও প্রকৃতির নির্দেশে। সে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্য, যার সীমান্ত বিস্তৃত হ'য়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে। আর এই সাম্রাজ্য, তা রক্ষণশীল কিম্বা শ্রমিক যে কোনো সরকার কর্তৃক শাসিত হোক না কেন, বঞ্চিত করেছে ভারতের জনসাধারণকে তাদের স্বাধীন জীবন থেকে, তাদের অন্ন থেকে, তাদের বস্ত্র থেকে। আর এই সাম্রাজ্যকে রক্ষা ক'রে তার ফলে, তাদের শাসককে সুদৃঢ় করার জন্যে ভারতবাসীকে অপরিমিত পরিমাণে শোণিত, শ্রম, অর্থ ও ধর্ম দিতে বলা হয়েছে। অথচ আসলে ভারত-সীমান্তের বাইরে ভারতের কোনো শত্রু নেই।

“গত কিছুদিন যাবৎ বৃটিশের চালে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। ভারতীয়

ও অন্যান্য সৈন্যদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে এবং জনসাধারণকে বলা হচ্ছে, যুদ্ধ ভারতে এলো ব'লে। কিন্তু কারা ভারতবর্ষকে সামরিক এলাকাভুক্ত করার জন্যে অসাধ্য সাধন করেছে? যদি বৃটিশ সরকার ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতকে যুদ্ধ-রত দেশ ব'লে ঘোষণা না করতো, তারা যুদ্ধের ভরণের জন্যে ভারতের সম্পদ, লোকবল, কাঁচামাল ও শ্রমশিল্পের সুযোগসুবিধাকে যে কোন প্রকারে আয়ত্ত ও ব্যবহার করার চেষ্টা না করতো, যদি বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দিকজোড়া এক যুদ্ধের ঘাঁটিতে পরিণত ক'রে না বসতো, যদি বিপরীতপক্ষে, ভারতকে আয়ার্ল্যাণ্ডের মতো নিরপেক্ষ থাকার সুযোগ দেওয়া হতো, তবে বর্তমানে যুদ্ধের গণ্ডীর মধ্যে ভারতবর্ষের এসে পড়ার কোনো সম্ভবনাই ছিল না। ব্রিটেন তার স্বার্থপর যুদ্ধ-প্রয়াসে অবশেষে ভারতের স্বেচ্ছাদত্ত সহযোগিতা লাভের আশায় ভারতবর্ষকে চালাকির দ্বারা যুদ্ধের এলাকায় টেনে আনতে চেষ্টা করেছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ রাজনীতিকরা ভারতবর্ষকে যেমন যুদ্ধে টেনে নিয়ে এসেছিল, আজ আবার তারা তেমনি যুদ্ধকে ভারতবর্ষে টেনে আনার চেষ্টা করছে। ভারতের জনসাধারণের পক্ষে বৃটেনের এই চক্রান্ত ধ'রে ফেলার চরম মুহূর্তে এসেছে।

"অবশ্য বৃটেনের এই কৌশলে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ ১৯৩৯ সাল থেকেই বৃটিশরা কেবলই অন্যান্য দেশের, অন্যান্য জাতির মধ্যে যুদ্ধ টেনে আনার চেষ্টা করেছে। নরওয়ে থেকে ক্রীট, লিবিয়া থেকে হংকং, সর্বত্রই তারা অন্যদেশের জনসাধারণকে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করেছে, উত্তেজিত করেছে। কিন্তু সর্বত্রই যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত এসেছে ঘনিয়ে, তখনই তারা অন্যান্য সবাইকে বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে আপনাদের বাঁচিয়েছে। এর সাক্ষ্য আমরা বারে বারে প্রত্যক্ষ করেছি, ডানকার্ক থেকে বাটাভিয়া পর্যন্ত। আধুনিক যুদ্ধের ফলে যে বেদনা, পীড়ন, দুঃখদারিদ্র্য ঘটে, তার হাত থেকে বৃটিশ ভারতবর্ষকে রেহাই দেবে, বৃটেনের কাছে এমনটি আশা ক'রে লাভ নেই। লড়াইএর সময় আমাদের দেশেও তারা পোড়ামাটির নীতি অবলম্বন করতে মুহূর্তের জন্য দ্বিধা

করবেই না। যে-সাম্রাজ্যের একদিন জন্ম হয়েছিল বন্যতা আর পরস্বলিপ্সা তার মধ্যে, যে-সাম্রাজ্য এতোদিন অসহনীয় অবিচারে পরিপুষ্ট হয়েছে, সে-সাম্রাজ্য যতোদিন বেঁচে থাকবে, ততোদিন সে অত্যাচার-অবিচার ও অত্যধিক করবেই। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ যদি ভারতবর্ষকে আজ যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে রাখতে চায়, তবে তাদের প্রয়োজন বৃটিশের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে ভারতবর্ষ থেকে দূরীভূত করা এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বৃটিশের এই ভারত শোষণের সমাপ্তি ঘটানো।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ জয়ের অর্থ হোলো—আমাদের নিজেদের দাসত্বকে চিরস্থায়ী করা। কেবল মাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ পতনের মধ্য দিয়েই ভারতের মুক্তি সম্ভব। সুতরাং, আজ কোনো ভারতীয় যদি দেশের মহত্তম স্বার্থের বিরুদ্ধে বৃটেনের হ'য়ে কোনো কাজ করেন, তবে তার স্বাধীনতার আদর্শের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। ভারতের জাতীয়তাবাদীদের কেবল মাত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেই চলবে না, তাঁদের সেই সংগে যুদ্ধ করতে হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও তাঁবেদারদের, আজকের মীরজাফর উমিচাঁদদের সংগে। আর, একথা দিবালোকের মতো সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত যে সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, তার সংগে আপোষ-মীমাংসার ভাব শুধু অর্থহীন নয়, হাস্যকরও।

"সম্প্রতি পার্লামেন্টে বক্তৃতা প্রসংগে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল, যুদ্ধ শেষ হবার পরে যথাসম্ভব সত্বর ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়েছেন। তাঁর যোজনায় ছিল, ভারতের জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণী-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মতৈক্য ঘটাতে এবং বর্তমানে ভারতবর্ষকে কতোখানি রাজনীতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে, তা স্থির করতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারত যাত্রা করবেন।

ভারতবর্ষ আজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সম্পর্কে আগ্রহান্বিত না। ভারতবর্ষে এখনো এমন লোক পাওয়া যায় যে যুদ্ধের পর বৃটিশ তার প্রতিশ্রুতি

শাসন করবে একথা এতটুকুও বিশ্বাস করে, এমন সব কল্পনা কেবল তারাই করতে পারে যারা নির্বোধের স্বর্গে বাস ক'রে আছে। ভারতের জনসাধারণ বেশ ভালো ক'রেই জানে যে, এই বহু বিজ্ঞাপিত এবং তথাকথিত মতানৈক্যটা বৃটিশের কৃত্রিম সৃষ্টি মাত্র। আর তারা এ কথাও জানে যে ভারতে বৃটিশ যতোদিন থাকবে ততোদিন তারা তাদের এই 'ভেদ ও শাসনের' দুষ্ট নীতি অবিরত চালিয়ে যাবে। মিঃ চার্চিল এবং তাঁর মন্ত্রীসভা অচিরেই উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরা ওয়েষ্টমিনষ্টার থেকে যে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলি ভারতের জনসাধারণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করেছেন, সেগুলি ভারতকে বৃটেনের পক্ষে আনতে সমর্থ হবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ অতীতের অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলির পথ অনুসরণ করতে চলেছে। এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে উঠবে নতুন এক দেশ—স্বাধীন, অখণ্ড ভারত। তাই এতো বিলম্বে স্যর ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ কিম্বা অপর কোনো বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞের ভারত যাত্রা আদৌ ফলপ্রসূ হবে না, বা দেশে কোনো সাড়া-ও জাগাবে না।

"বর্তমানের এই কুরুক্ষেত্রের একদিকে হলো ভার্সাই বা অনুরূপ সন্ধিসর্ত থেকে গ'ড়ে-ওঠা পুরাতন বিধিব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা এবং অপর দিকে জীর্ণ পুরাতনকে ধ্বংস ক'রে নতুনের অভ্যুদয়ের জন্যে এক অটল প্রতিজ্ঞা। সুতরাং আজকের এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ তার পায়ের শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাতে পারে না। আর, ভারতের জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা আজ কেবল পূর্ণ হ'তে পারে পুরাতন বিধিব্যবস্থার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে নয়, পুরাতন বিধিব্যবস্থার ধ্বংসের মধ্য দিয়ে—যে পুরাতন বিধিব্যবস্থার অর্থ হোলো ভারতবাসীর কাছে লাঞ্ছনা, এবং হীনতা দাসত্ব এবং মৃত্যু।

"আধুনিক ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমার স্থির বিশ্বাস জন্মে, গত বিশ্বযুদ্ধের ফলে যেমন কতকগুলি প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল, তেমনি এই যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙনের মধ্যে। ত্রিশক্তি, জার্মানি, ইতালি, এবং জাপান যাদের দায়িত্ব এই যুদ্ধের পরম পরিণতি

সংঘটিত হবে, তাঁরা আমাদের মিত্র এবং সহায়। এই শক্তিদ্বয় ভারতের বিপদের কারণ হবে, একথা বলার মতো অসত্য মিথ্যা আর নাই। এই ত্রিশক্তি সম্পর্কে আমার যে গভীর জ্ঞান রয়েছে তা থেকে আমি জোরের সংগে বলতে পারি, ভারতের এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ছাড়া ভারত সম্বন্ধে আর কোনো ধারণাই এঁরা পোষণ করেন না। যদি এ সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকে তবে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো সম্প্রতি যে ঐতিহাসিক ঘোষণা করেছেন, তা থেকে আমার স্বদেশবাসীর সে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে। এবং ভবিষ্যতেও কোনো ভারতীয় আর বৃটিশ প্রচারে প্রতারিত হবেন না। সুতরাং আজ আমাদের পরম আনন্দের দিন যে, ত্রিশক্তির যুগপৎ আঘাতের ভারে আমাদের চিরদিনের শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্য দ্রুত গুঁড়িয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন, কারণ সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সামরিক বাহিনী বিজয় গর্বে সদর্প এগিয়ে চলেছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন, কারণ ভের্সাই-এ যে পুরাতন বিধিব্যবস্থার পত্তন হ'য়েছিল আজ তা আমাদের চোখের সামনে ধসে ধসে পড়ছে। আজ আমাদের আনন্দের দিন, কারণ নতুন দিনের আজ শুরু—যে-দিন আনবে ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের ন্যায্য অধিকার, ভারতের সুখ, ভারতের ঐশ্বর্য।

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ!"

ক্রিপসের সাম্রাজ্যবাদী অভিনয়

[আজাদ্ হিন্দ্ রেডিও (জার্মান) মারফৎ বেতার-প্রচার, ২৫শে মার্চ, ১৯৪২]

"আমি সুভাষচন্দ্র বসু। আমি আজো বেঁচে আছি, এবং 'আজাদ হিন্দ' রেডিও মারফৎ আপনাদের বলছি। বৃটিশের সংবাদ প্রচারকেরা সারা দুনিয়ায় রটনা করেছে যে, আমি টোকিয়োতে কোনো জরুরি সভায় যোগদানের জন্যে যাওয়ার পথে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছি। গত বছর আমি যখন ভারতবর্ষ থেকে চলে আসি, তখন থেকেই বৃটিশ প্রচার বিভাগ আমার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বহু স্ববিরুদ্ধ সংবাদ ঘোষণা করেছে। এবং ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলি আমার সম্বন্ধে অশোভন ভাষা ব্যবহার করতেও এতোটুকু ত্রুটি করেনি। সম্প্রতি আমার মৃত্যুর যে সংবাদ রটনা করা হ'য়েছে, তা সম্ভবত ইচ্ছা প্রণোদিত চিন্তার উদাহরণ মাত্র। আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, ভারতীয় ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে আমি মারা গেছি এটুকু দেখতে পেলেই বৃটিশ সরকার খুশী হয়। কারণ, বৃটিশ সরকার আজ ভারতকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উদ্দেশ্যে জগকে টানবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

"একটু আগেই আমি যে বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখ করেছি, তার বিশদ বিবরণ বর্তমানে আমার কাছে নেই। সুতরাং এই বিমান ধ্বংসের পেছনে আমাদের শত্রুর কোনো হাত ছিল একথা আমি বলতে পারি না। যাই হোক, যারা এই দুর্ভাগ্যজনক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁদের জীবন হারিয়েছেন, আমি তাঁদের প্রতি আমার বিনীত শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের দেশপ্রেমিক বীর তাঁরা।

"বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে যা দিতে চেয়েছেন, এবং সে সম্পর্কে স্যর

ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যে বেতার-বক্তৃতা দিয়েছেন, তা আমি বিশেষভাবে আলোচনা ক'রে দেখেছি। সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই মামুলি 'ভেদ ও শাসন' নীতিকে কাজে লাগাবার চেষ্টাতেই যে ভারত যাত্রা করেছেন, তা আজ সকলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ ধারণা আমার দৃঢ়ভাবে জন্মেছে। যে-ভূমিকায় মিঃ আমেরির মতো কোনো রক্ষণশীল রাজনীতিকের অবতীর্ণ হওয়া সুশোভন হোতো, সেই ভূমিকায় সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নামটা অনেকে আশা করেন নি। সার ষ্ট্যাফোর্ড নিজেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর মতে, ভারতবর্ষকে যে সকল শর্ত দেওয়া হ'য়েছে, সেগুলি ত্রুটিহীন এবং সেগুলির চেয়ে ভালো শর্ত আর হয় না; আর, বৃটিশ মন্ত্রীসভাও সেই সকল প্রস্তাব সম্পর্কে একমত।

"এ থেকে আরো একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভারত সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উঠলে বৃটেনের বিভিন্ন দলের মতবিরোধ আর থাকে না। সার ষ্ট্যাফোর্ড আমাদের জানিয়েছেন যে, ভারতবর্ষ কোনো একটি ক্ষুদ্র মহাদেশ, যেখানে বহু জাতি এবং বহু শ্রেণী-সম্প্রদায়ের বাস। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, খৃষ্টীয় যুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বে—ইংল্যাণ্ডের একত্রিত হবার হাজার বছরেরও বেশি আগে—মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষ একত্রিত হয়েছিল।

"বৃটেন তার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে, যেমন আয়ার্ল্যাণ্ড কি প্যালেষ্টাইনে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মাবার চেষ্টায় ধর্মকে ব্যবহার করেছে। ভারতবর্ষে বৃটেন এই উদ্দেশ্যে কেবল যে ধর্মকে ব্যবহার করেছে তাই নয়,—সে ব্যবহার করেছে, দেশীয় রাজা এবং অনুন্নত সম্প্রদায় প্রভৃতির মতো অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রকেও। এখন সার ষ্ট্যাফোর্ড-ও ভারতে এসেছেন সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সেই অস্ত্রেই ব্যবহার করতে। ভারতের জনসাধারণের একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া চালাবার সঙ্গে সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের উপর শাসন ও অত্যাচারের যে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতি বৃটেন এতোদিন ব্যবহার ক'রে এসেছে, সার ষ্ট্যাফোর্ড-ও যে সেই নীতির সমর্থক হ'য়েছেন তা কম লক্ষনীয় নয়। তাই আজ যখন একদিকে সার ষ্ট্যাফোর্ড একজন রাজনীতিকের

সংগে আলাপ আলোচনা করছেন, তখন অপর দিকে কারাগারে অন্যদের পেছনে আটকে রাখা হ'য়েছে—স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্ভীক দুর্দম যোদ্ধাদের। বৃটিশ-রাজনীতিকদের এই ধূর্ত অসাধু নীতি সম্পর্কে ভারতের জনসাধারণ সম্পূর্ণ সচেতন। আজ আমি নিঃসন্দেহ যে, একদিন এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের আত্মশক্তি কারাগারের পাষাণ প্রাচীরগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেবে, উদ্বুদ্ধ ক'রবে ভারতের জনসাধারণকে, তাদের জানাবে, এ তাদের অপমান লাঞ্ছনা নয়, এ অপমান সমস্ত দেশের, এ লাঞ্ছনা সমস্ত ভারতের।

"লণ্ডনের সংবাদপত্র 'ডেলি টেলিগ্রাফ' যথার্থ-ই বলেছে, সার ষ্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাবগুলির মধ্যে মূলত নূতন কিছুই নেই। সার কথা হোলো, সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস, এবং তা-ও কার্যে পরিণত হবে যুদ্ধের পরে। কিন্তু প্রস্তাবে যে শর্ত দেওয়া হয়েছে, তা এবং সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের বক্তৃতা এবং 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের' মত সংবাদপত্র সমূহের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট-ই বোঝা যায় যে, বৃটিশ সরকারের আসল উদ্দেশ্য হোলো ভারতকে কয়েকটি রাজ্যে খণ্ডিত করা—গত যুদ্ধের পর আয়ার্ল্যাণ্ডে তারা ঠিক যেমনটি করেছিল। বৃটেনের এই প্রস্তাবকে ভারতবর্ষ বিবেচনা করার যোগ্য ব'লে ভাববে কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। স্বভাবত ভারতবর্ষ হোলো অতিথিবৎসলের দেশ। সুতরাং, ভারতের অতিথিবাৎসল্যকে সার ষ্ট্যাফোর্ড যদি তাঁর প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন ব'লে ভেবে বসেন, তবে তিনি একটি শোচনীয় ভুল করবেন।

সার ষ্ট্যাফোর্ড সাম্রাজ্যবাদী অভিনয়ের চরম দেখিয়েছেন যখন তিনি দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মিলনে বলেন যে ভারতবর্ষ একমত হ'য়ে কোনো গঠনতন্ত্র রচনা করতে সমর্থ হয় নি। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে জানে, ভারতের এই সমস্ত অনাচার ও উৎকোচ গ্রহণের জন্যে বৃটিশ সরকারই একমাত্র দায়ী। সুতরাং, ভারতীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস যে আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক, প্রচার ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আসবে, এমন ধারণা সম্পূর্ণ মূঢ়তা এবং আত্ম

তাদের এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে, যার শক্তি ও কার্যকারিতা অনেক বেশি।

সার ষ্ট্যাফোর্ড আরো বলেছেন যে, যুদ্ধ-কালে ভারতের জন্যে নূতন কোনো গঠনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব হবে না; সুতরাং ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের শুরু হবে যুদ্ধ-সমাপ্তির পরে। আমি সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বহুদিন আগে, গত ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশ সরকারের এক জবাবে জানিয়েছিলাম, অবিলম্বে জনসাধারণের অধিকাংশের বিশ্বাসভাজন এক সাময়িক জাতীয় সরকার স্থাপন করা দরকার। এই সাময়িক জাতীয় সরকারকে বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট দায়ী রাখা চলবে। অর্থাৎ, এই সাময়িক জাতীয় সরকার ভারতীয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের নিকট দায়ী থাকবেন। কংগ্রেসের অন্তর্গত ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব আমি প্রথম উত্থাপন করি। এই প্রস্তাবটির মধ্যে ন্যায়সংগত যুক্তি এবং কার্যকরী হবার সম্ভাবনা থাকায় সরকারী কংগ্রেস কমিটিও এ-টিকে তাঁদের নিজেদের দাবী হিসাবে গ্রহণ করেন। যাই হোক, কিন্তু আসল ব্যাপার হোলো বৃটিশ সরকার বর্তমান সময়ে তাঁদের অধিকার ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। হয় সংখ্যালঘিষ্ঠের, নয় দেশীয় রাজন্যবর্গের, নয় তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের ধুয়া তুলে তাঁরা যে কোনো মুহূর্তে একটা কারণ বাৎলাতে পারেন যে, ভারতবাসীদের মধ্যে একতা ব'লে কোনো বস্তু নেই। সার ষ্ট্যাফোর্ড যদি ভাবেন, ভারতবাসীর কাছে এই ধরণের কোনো ফাঁকা প্রস্তাব হাজির ক'রে তাদের স্বাধীনতার স্পৃহা নিবৃত্তি করবেন, তবে তিনি যে নির্বোধের স্বর্গে বাস ক'রে আছেন, বলতেই হবে। গত বিশ্বযুদ্ধে ভারতের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু সেবারে ভারতবর্ষ তার পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল আরো নির্যাতন ও অগণিত নরহত্যা। ভারতবর্ষ সে সমস্ত কথা ভোলেনি। তাই ভারতবর্ষ আজ দেখবে, যাতে তারা বর্তমানের এই সুবর্ণ সুযোগ না হারায়।

"বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবীগুলিকে নাকচ

করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর একটি প্রতিষ্ঠানকে মুখোমুখি করছে, সেটি হোলো মুসলিম লীগ। কারণ, মুসলিম লীগ তাদের মতামতের দিক থেকে বৃটিশের অনুকূল ব'লে পরিচিত। এবং, বস্তুত, বৃটিশের প্রচার যন্ত্র জনসাধারণের মধ্যে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছে যে, প্রায় কংগ্রেসের মতোই মুসলিম লীগও একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর মধ্যে সত্য একেবারেই নেই। বাস্তবে ভারতবর্ষে কতিপয় প্রতিপত্তিশালী মুসলিম প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলি জাতীয়তাবাদী। শুধু তাই নয়, বৃটিশ ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে মাত্র চারটি প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবং এই চারটি প্রদেশের মধ্যে মাত্র একটি প্রদেশে, পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা আছে, বলা যেতে পারে। এমন কি এই পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীও মুসলিম লীগের প্রধানতম কার্যসূচির—ভারত বিভাগের—ঘোরতর প্রতিরোধ ক'রে আসছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিম লীগ কেবল একটিমাত্র প্রদেশেই নিজেদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধি ব'লে দাবী করতে পারে। কিন্তু তথাপি বৃটিশ গভর্নমেন্ট ব'লে থাকেন, ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই ভারতে স্বাধীনতা চায় না।

"আর, ভারতের রক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যতোদিন যুদ্ধ চলবে, ততোদিন ভারতের সামরিক কর্তৃত্ব বৃটেনের হাতেই থাকবে, এমন কি ভারতের বড়লাট বা প্রধান সেনাপতির হাতেও না। এই নীতির অনুসরণ ক'রে বৃটিশ দু'টি উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। এক দিকে তারা চায়, সমস্ত সাম্রাজ্যের জন্যে ভারতের শক্তি-সম্পদকে পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করতে; অপর দিকে বৃটেনের শত্রুর ভারতবর্ষে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করুক, যার ফলে ভারতবর্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় বৃটিশের মিত্ররূপে যুদ্ধে যোগদান করবে। কিন্তু, আমি আজ সাধ্য মতো জোরের সংগে বলতে পারি, যদি অবশেষে যুদ্ধ সত্যেই ভারতে এসে পৌঁছয়, তবে সে জন্যে দায়ী হবেন বৃটিশের অনুগামী সেই সব চাকরীজীবীরা, যাঁরা আজ বৃটেনের সংগে যুদ্ধে সহযোগিতা করছেন। আমি আমার দেশবাসীদের সতর্ক ক'রে দিতে চাই যে বর্তমানে বৃটিশের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

[আজাদ হিন্দ্‌, রেডিও (জার্মানি) থেকে [illegible]-প্রচার, ১০ই এপ্রিল, ১৯৪২ সাল]

"আমি সুভাষ চন্দ্র বসু। ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 'আজাদ হিন্দ্‌ রেডিও' মারফৎ বলছি। বোনেরা ও ভাইএরা! ভারতের কাছে বৃটিশ যে প্রস্তাব পাঠিয়েছে, তার প্রতিক্রিয়াশীল আবহ স্বরূপ লক্ষ্য করার পরেও আমাদের কয়েকজন স্বদেশবাসী এখনো মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের ভারতে প্রেরিত প্রতিনিধি স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের সংগে আলাপ-আলোচনা চালাবার শ্রম স্বীকার করছেন। সত্যই, এ অতীব মর্মান্তিক।

"ভারত সামরিক সীমান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং বৃটিশ প্রচারের দৌলতে প্রভাবিত হওয়ায়, আমাদের দেশীয় জনসাধারণের অনেকে বর্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্য যে টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যে তা পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হ'য়ে যাবে, তা উপলব্ধি করতে পারছেন না। সুতরাং, বৃটিশ আজ ভারতকে যে সকল শর্ত দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আপোষ মীমাংসার উপযোগী শর্ত দিলেও বৃটেনের সংগে ভারতের বিটমাটের কোনো অর্থ হয় না। যুদ্ধের পর পূরণ করা হবে, এ রকম কোনো বৃটিশ প্রস্তাবে এতটুকু-ও আস্থা রাখে, এমন কোনো ভারতীয়ই আর নেই। অথচ, এই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে-ও আমাদের কতিপয় উদারনৈতিক বন্ধু একটা আপোষ মীমাংসা ঘটাবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলছেন, তবে, বৃটেন যে যুদ্ধের পর তার প্রতিশ্রুতি পালন করবে, এ সম্বন্ধে সমস্ত মিত্রশক্তি এবং 'বৃটিশ ডোমিনিয়নের সরকারগুলিকে কথা দিতে হবে। কিন্তু, এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে বাধ্য করবার মতো কোনো ক্ষমতা যদি আমাদের হাতে না থাকে, তবে এই সব প্রতিশ্রুতির-ই বা কি দাম আছে?

প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফার কি দুর্দশা ঘটেছিল, সে কি আমরা ভুলে গেছি? আর এ-ও কি আমরা ভুলে গেছি যে, প্রেসিডেন্ট রোজভেল্টের প্রতিনিধি জেনারেল ডনোভান, রোজভেল্টের চিঠি পকেটে নিয়ে এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে বলকান দেশগুলিকে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্যে অনুরোধ ক'রে, উত্তেজিত ক'রে বলকানময় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন? এই সমস্ত দেশ,—যাদেরকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে প্ররোচিত ও উত্তেজিত করা হ'য়েছিল, যখন এক্সিস শক্তির কাছে তারা পরাজিত হোলো, তখন তারা কি তাদের ভাগ্যের কাছে পরিত্যক্ত হয়নি? সে কথা কি আমরা আজ ভুলে গেছি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দুনিয়ার কয়েকজনের এই অজ্ঞতা থাকলো থাকতে পারে, কিন্তু আমার অধিকাংশ স্বদেশবাসী জেনেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ কয়েকটি উদার রাষ্ট্রের অভিভাবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, এবং তারা ভাবে ভেঙে-পড়া ধ্বসে-পড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের তারাই হোলো উত্তরাধিকারী। যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষক হিসেবে বৃটিশের দালালি করেছে এবং এখনো করছে, আজকে তাদের দেখলে হাসি পায়। আজ পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারে। অতীতে অন্যান্য সাম্রাজ্যগুলি যে পথে গেছে, আজ বৃটিশ সাম্রাজ্য চলেছে সেই পথে। এমন কি যদি সমগ্র ভারতবর্ষ তার সমস্ত শক্তি সম্পদ নিয়ে শেষ-মানুষটি পর্যন্ত যুদ্ধ করে, তবু, সম্ভবত, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন আজ এড়ানো সম্ভব হবে না। বৃটিশ অতীতে ভারতবর্ষকে দাস ও দরিদ্র ক'রে রেখে যে নীতির অনুসরণ ক'রে এসেছে, আজ তাকে তার অব্যর্থ ফল ভোগ করতে হবে। এমন কি, কালই যদি ভারতবর্ষে একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তথাপি, সম্ভবত, বর্তমান যুদ্ধকালের মধ্যেই একটি পূর্ণসজ্জিত আধুনিক সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবে না। তবু আজকে এটা নতুন কিছু ব্যাপার না যে, যে-সমস্ত ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচিয়ে এসেছেন, তাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক ব'লে নিজেদের পরিচয় দেন। এই সমস্ত ভদ্রলোকেরাই অতীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের গৌরব রক্ষার জন্যে প্রাণপাত করেছেন। যে হেতু ধূর্ত বৃটিশ তাঁদের সিংহের আসনে বসিয়েছে,

সেই হেতু তাঁরা আপনাদের সুবিধামতো ভুলে যান যে ভারতবর্ষ আজ বৃটিশের পদানত। তাঁরা পৃথিবীর প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবার কথা আওড়ান। তাঁরা খোলাখুলিভাবে বলেন না যে বৃটিশের সংগে হাত মেলাতে হবে; তাঁরা চীনের সংগে, রাশিয়ার সংগে, কি আমিরিকার সংগে হাত মেলাবার কথার আড়ালে তাঁদের নিজেদের আসল উদ্দেশ্যটা লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু এই ধরণের লুকোচুরি ভারতের জনসাধারণকে প্রতারিত করতে পারবে না। কারণ, তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনো অস্তিত্ব নেই। আজ ভারতবর্ষের সংকট মুহূর্তে আমি আমার স্বদেশবাসীদিগকে সাবধান ক'রে দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে, এ আপোষ-মীমাংসা খুঁজে বেড়ানো নয়, এ হোলো তাঁদের যুদ্ধের সন্ধানে ফেরা। বৃটিশেরা ভারতবর্ষকে তাদের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছে, তার আংশিক কারণ, তারা চায় এক্সিস শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করুক; এই আক্রমণের ফলে ভারতের জনসাধারণকে অবশেষে যুদ্ধে বৃটেনের সহযোগী করা সম্ভব হবে। কিন্তু এক্সিস শক্তি, তাদের পক্ষ থেকে ভারতের স্বাধীনতার প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। শান্তিকামী আর্য্যাবর্তকে আক্রমণ করার ইচ্ছা যেমন তাদের নেই, তেমনি ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার কোনো আকাঙ্খাও নেই তাদের। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো ভারতে বৃটেনের সামরিক ঘাঁটিগুলিকে ধ্বংস করা; কারণ এগুলিকে ধ্বংস না করলে যুদ্ধে জয়লাভ করা তাদের অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

"বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার শর্তে বৃটেনের সংগে এখন কোনো আপোষ মীমাংসার অর্থ হোলো ভারতবর্ষকে এক্সিস শক্তির শত্রুতে পরিণত করা এবং এক্সিস শক্তিকে শুধু ভারতের বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলি নয়, বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতীয় সহযোগীদেরও আক্রমণ করতে বাধ্য করা। আজ যাঁরা বৃটেনের সংগে আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করছেন, তাঁরা কি একথা বুঝেছেন যে তাঁরা বস্তুত যুদ্ধকে ভারতে টেনে নিয়ে আসার চেষ্টাই করছেন! আপোষ-মীমাংসার সর্বপ্রথম ফলাফল হবে ভারতবর্ষে যুদ্ধকে টেনে আনা, ভারতবর্ষের

সম্পদ-ঐশ্বর্য গ্রহণ করা এবং ভারতের স্বাধীনতাকে পেছিয়ে দেওয়া। এর ফলে ভারতবর্ষে যারা আপোষমীমাংসার মোহে ঘুরছেন, তাঁরা অচিরে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। এবং এই ঘোষণার অর্থ হবে অচিরে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় এবং সেই পরাজয়ের সহজাত ঘৃণা ও হীনতাকে ব'য়ে নিয়ে আসা।

"পরাজয়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে বৃটিশ যখন এ-দেশ ছেড়ে পালাবে—অতএব জেনারেল ম্যাক আর্থার এবং জেনারেল স্টিলওয়েল যা করেছেন—তখন তারা তাদের নবাবিষ্কৃত পোড়া মাটির নীতি অনুসারে পুড়িয়ে ধ্বংস ক'রে দিয়ে যাবে সমস্ত দেশকে। ভারতবর্ষ যখন যুদ্ধের এলাকার মধ্যে নেই, তখন বৃটিশেরা এখানে যুদ্ধের বেসাতি করছে কেন? শুধু যে এ দেশের জনসাধারণকে স্বদেশে ভয়াবহ যুদ্ধের কবলে পড়তে হবে তা নয়, তাঁদের এমন একটি যুদ্ধ করতে হবে, যে-যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে শোচনীয় পরাজয়ে। আমার স্বদেশবাসীগণ একবার মানচিত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন, আজকে বৃটিশের অবস্থা কি শোচনীয়। ইওরোপ থেকে তারা বিতাড়িত। আফ্রিকায়, গোড়ার দিকে কয়েকটি জয়লাভের পর, এখন তারা পলায়নের পথে। নিকট ও মধ্য প্রাচ্য, যেখানে সেদিন পর্যন্ত বৃটিশের কর্তৃত্ব বহাল ছিল, আজ সেগুলি বারুদের স্তূপে পরিণত হ'য়েছে, বিস্ফোরণের জন্য প্রয়োজন শুধু স্ফুলিংগের। আর দূর প্রাচ্যে, সর্বত্র তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সর্বত্র জাপানীরা পদাঘাত ক'রে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের একমাত্র আশা হোলো ভারতবর্ষ; আর সেই জন্যেই আজ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ আমাদের দোরে এসে ধর্ণা দিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যকে তার দুর্নিবার পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। হয় ভারতবর্ষ আজ তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে, নয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতনে যাবে তলিয়ে। যদি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ নিজেকে ভারতের বন্ধু ব'লে দাবী ক'রে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড়ো উপকার করা হবে ভারতবর্ষকে যুদ্ধের বাইরে রাখা। ভারত তখন নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং স্বাধীনতা পাবে। দীর্ঘদিন পরে অবশেষে বৃটিশ বুঝেছে যে, ভারতবর্ষে তার

আর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার নেই। তাই তারা মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সাহায্য নিয়েছে, তাই আজ হোয়াইট হাউস থেকে পত্র পেয়েই মিঃ লুইস জনসন ছুটে এসেছেন ভারতবর্ষে। মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের পাশ থেকে এবং ওয়াশিংটন থেকে যে প্রস্তাব এসেছে, ভারতবাসীরা যদি তাতে সাড়া না দেয়, তবে তাদের যে কি শোচনীয় পরিণতি ঘটবে, সে সম্বন্ধে আমেরিকা সতর্ক ক'রে দিয়েছে। কিন্তু আমি আমার স্বদেশবাসীদের কাছে আবেদন করি, তাঁরা যেন বৃটিশের প্রচারে আর প্রতারিত না হন। মিত্রশক্তির রাজনীতিকেরা যে জাল ফেলেছে, তাতে পা দিলেই ভারতের সব চেয়ে বড়ো বিপদ ঘটবে। আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হোলো, আমাদের দেশ যাতে পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়, সে জন্যে চেষ্টা করা। এবং বৃটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে সহযোগিতা করতে অস্বীকার ক'রেই মাত্র আমরা তা করতে পারি। আমি পরিপূর্ণ দায়িত্বের সংগে বলতে পারি, ভারত যদি বৃটেনের সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত না হয়, তবে ত্রিশক্তি কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হবার বিন্দুমাত্র সম্ভবনাও নেই। আমার স্বদেশবাসীর কাছে আমার পরবর্তী আবেদন, যুদ্ধকে ভারতের বাইরে রেখে তাঁরা অবিলম্বে তীব্রতর ভাবে স্বাধীনতার জাতীয় সংগ্রাম পুনরায় শুরু করুন। বৃটেন ভারতের অচিরে স্বাধীনতা লাভের দাবীকে অস্বীকার করেছে। এখন ভারতবর্ষকে তার নিজের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে। ভারতের মুক্তি অর্জনের এর চেয়ে বড়ো সুযোগ কেউ কল্পনা করতে পারে না।

"অবশেষে, আমার স্বদেশবাসীদের আমি বলতে চাই, আমরা, যারা ঘটনাক্রমে ভারতের বাইরে আছি, এই দীর্ঘ মাসের পর মাস নিস্ক্রিয় ছিলাম না। আমরা সজাগ কৌতূহলের সংগে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছি, এবং আগামী সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করেছি নিজেদের। আমাদের এই চূড়ান্ত সংগ্রাম ভারতকে এনে দেবে তার বহু-আকাঙ্খিত লক্ষ্য,—স্বাধীনতা, মুক্তি। আমরা জানি যে বৃটিশ নৌ-শক্তির ওপর ভর করে বৃটিশ সাম্রাজ্য একদিন গ'ড়ে উঠেছিল, সে বৃটিশ নৌ-বাহিনী আজ অতীতের কিংবদন্তী মাত্র।

আর এ-ও আমরা জানি, জাপানের বিরুদ্ধে ভারতকে আটকে রাখার মতন ব্রিটেনের না আছে বিমান শক্তি, না আছে জন-বল। সুতরাং আজ আমাদের কাছে এ অতি স্পষ্ট যে, ভারতের জাতীয় মুক্তির শেষ সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্যে আমরা ভারত অভিযান করতে বাধ্য হবো। আমরা সংগ্রাম করবো আমাদের সকল শক্তি দিয়ে, সমস্ত সম্পদ দিয়ে। এবং বিধাতার আশীর্বাদ ও বন্ধুদের সহায়তায় আমরা জয় করবো আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের মুক্তি।”

স্বদেশবাসিগণ! যুদ্ধ চালিয়ে রাখুন

[আজাদ হিন্দ্ রেডিও (জার্মানি) থেকে বেতার ঘোষণা, ৩১ আগষ্ট, ১৯৪২]

"আমি সুভাষ চন্দ্র বসু, আজাদ হিন্দ্ রেডিও থেকে বলছি।

"বন্ধুগণ! দুই সপ্তাহ আগে, আমি গতবার যখন আপনাদের বলেছিলাম, তখন থেকে অপ্রান্ত শক্তির সংগে চলেছে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ঝড়বায়ির মতো ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে পল্লীতে। গত একমাস কাল ধ'রে বৃটিশ প্রচার যন্ত্র লোকের মধ্যে কেবল এই ধারণার সৃষ্টি করতে চাইছে যে, অভিযানে এবার ভাটা পড়েছে, এবং সব কিছু শান্ত ভাব ধারণ করছে। কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ হয়েছে ব্যর্থ। কারণ সেই সংগে বি, বি, সি এবং তার প্রচারকেরা সংবাদ দিয়েছে যে,—দিতে বাধ্য হ'য়েছে বলাই ভালো,—সমস্ত দেশময় আরো বহু নিরস্ত্র নর নারীর ওপর গুলী চালানো হয়েছে। আমি আপনাদের নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি, ভারতের ওপর বৃটিশ পর্দা টানার যতোই চেষ্টা করুক না কেন, খৃষ্টীয় ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না। আসলে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ছোট-খাটো সমস্ত সংবাদ, শহরে পল্লীতে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা এবং গুলীচালনার সকল কাহিনী তা যেখানেই হোক, রামনাথে কিম্বা ওয়ার্ধায়, বিক্রমপুরে কিংবা লক্ষ্ণৌঙ অবিলম্বে সেগুলি মিত্রপক্ষীয়দের শত্রু বা নিরপেক্ষ দেশের সংবাদ পত্রে ও বেতারে প্রচারিত হচ্ছে। বন্ধুগণ! আমাদের পূর্ব অভিযানগুলির সময়ে ভারতে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নৃশংস অত্যাচারের ইতিহাস বাইরের জগৎকে জানানো কতো কঠিন ছিল, তা আমার ভালো করেই জানা আছে। আজ, সে সমস্ত বাধা আর নেই। ভারতে কি ঘটছে, তার সমস্ত সংবাদ বাইরের পৃথিবীকে

জানিয়ে, ভারতের এই মহাপরীক্ষার পথে জগতের সবার কাছে সহানুভূতি ও সাহায্য সংগ্রহ করার সামর্থ্য কর্মে আমি নিজকে ব্রতী ক'রেছি। আজ যদি আপনারা আপনাদের চোখ দিয়ে দেখেন এবং কান দিয়ে শোনেন যে, আপনাদের বন্ধুরা ভারতের মহাসংগ্রামের কাহিনী বিদেশে কেমন সুরে প্রচার করছে, তবেই আপনারা বুঝতে পারবেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছে ভারতবর্ষ আজ কতোখানি সহানুভূতি পেয়েছে। আর, বৃটিশের অত্যাচার ও নৃশংসতা যতোই বাড়তে থাকবে, ভারতের জন্যে এই সহানুভূতি ও ব্যাপকতায় এবং তীব্রতায় চলবে তাতেই বেড়ে। আপনাদের জাতীয় মুক্তির জন্যে আমরা যে পরিমাণে উৎপীড়ন নির্যাতন সইবো, আমরা যে পরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ করবো, জগতের সমক্ষে আমাদের মর্যাদা ও বৃদ্ধি পাবে সেই পরিমাণে।

"বন্ধুগণ! একথা ও আমি আপনাদের বলতে চাই, আমরা জগতের জনমতের কাছে আজ যেমন মানসিক সহানুভূতি পেয়েছি, তেমনি তাঁদের কাছ থেকে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে পেতে পারি অস্ত্রসজ্জা প্রকার সাহায্য-ও। সুতরাং আধুনিক অস্ত্র ও আধুনিক নৃশংসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আপনারা যদি নিজেদের দুর্বল মনে করেন, এবং বাইরের বন্ধুদের সাহায্য চান, তবে শুধু একটিবার তা জানালেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের এই বন্ধুরা, যাঁরা ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, তাঁরা ভারত যতোদিন না চাইবে, ততোদিন কোনো সাহায্য দিতে অগ্রসর হবেন না। আমাদের জাতীয় মর্যাদা এবং স্বার্থের খাতিরে যতোক্ষণ বাইরের সাহায্য না নিয়েই আমাদের চলবে, ততোক্ষণ আমরাও কোনো প্রকার সাহায্য চাইবো না। এই প্রসঙ্গে আমি পুনরায় আপনাদের কাছে একটি আবেদন জানাতে চাই। অচিরে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্যে আপনাদের যে সকল স্বদেশবাসী দেশের বাইরে প্রাণপণ খাটছে, তাঁদের আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করুন। আজ আমরা ভারতের জাতীয় মর্যাদার রক্ষী, ভারতের সেবাকারী রাজদূত। দেশেও যেমন, বিদেশেও তেমনি আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি। আমাদের আত্মনিয়োগ সংক্রান্ত জাতীয় অধিকারের ওপর কোনো

বিদেশী শক্তি হস্তক্ষেপ করে, তা আমরা কখনই সহ্য করবো না। কোনো তত্ত্ব বা নীতিবাদের দ্বারা আপনারা যেন অভিভূত হয়ে না পড়েন। অন্যান্য দেশের আভ্যন্তরিক রাজনীতি, যার সংগে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, তা নিয়েও মাথা ঘামাবেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যারা শত্রু, তারা আমাদের মিত্র, আমার এ কথা আপনারা বিশ্বাস করুন। বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ুক এবং ভারতবর্ষ আবার স্বাধীন হ'য়ে উঠুক, এর মধ্যে তাদের স্বার্থ আছে। কারণ, তারা জানে, যতোদিন ভারতবর্ষ বৃটিশের কবলে থাকবে, ততোদিন তাদের পক্ষে জয়ী হওয়া অসম্ভব এবং ততোদিন জগতে শান্তি নেই। রাজনীতি-ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থ ছাড়া কোনো বিদেশী শক্তি আমাদের সহানুভূতি দেখাবে, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

"বন্ধুগণ! আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, গত কয়েক মাস ধ'রে বৃটিশ সাম্রাজ্য তার চরমতম অশুভ-দিনগুলি যাপন করছে। লণ্ডনের সেদিন আর আজ নেই, যেদিন লণ্ডন ছিল পৃথিবীর মহানগরী। সেদিন আর আজ নেই যেদিন সমস্যা সমাধানের জন্যে রাজা ও রাজনীতিকগণ ছুটতেন লণ্ডনে। সেদিন আর নেই যেদিন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাতের জন্যে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ছুটতে হোতো ইউরোপে। ইংরেজ কবি টেনিসনের নিজের ভাষায় The old order changes yielding place to new and God fulfils himself in many ways.' তাই আজ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে ; তাই, মার্কিন সেনারা আজ আর বৃটিশ আইনের আওতায় পড়ে না ; তাই আজ বহু যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিন কর্মচারীরা বৃটিশ বাহিনীর মাতব্বরী অস্বীকার করছে। এইভাবে, বৃটেন আর তার সাম্রাজ্য যোজনেন্টের 'নয়া সাম্রাজ্যের' উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে ক্রতগতিতে। কিন্তু নূতন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকতে-ও ভারতের ইচ্ছা নেই, সুতরাং তাকে আজ যুদ্ধ করতে হবে নতুন ও পুরাতন দুটি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যে যে পরিবর্তন এসেছে, তার সবচেয়ে কৌতুককর অধ্যায় হোলো, আজ বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদের পরম পুরোহিত, ভারতীয় জাতীয়তার সেরা শত্রু, সকল প্রকার সমাজতন্ত্রবাদের শপথগ্রহী প্রতিদ্বন্দ্বী, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ উইনষ্টন চার্চিল তাঁর সাম্রাজ্যবাদীয় সকল মতকে অবহেলায় হজম ক'রে মস্কো-এ ষ্টেলিনের বান্দর।

"এ থেকেই কি স্পষ্ট বোঝা যায় না যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রতিনিধি আজ মরিয়া হ'য়ে সব কিছুই করতে পারে, শুধু পারে না ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকারের কথা কোনোমতে ভাবতেও। ভারতবর্ষ হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের মণি। এই মণিটিকে অধিকারে রাখার চেষ্টায় বৃটিশ জনসাধারণ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবে। সুতরাং ভারতের জনসাধারণের, বিশেষত জননায়কদের এখন একমাত্র কর্তব্য বৃটেন ভারতবর্ষের দাবী মঞ্জুর করবে এই আশা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বৃটিশের শেষ মানুষটি পর্যন্ত যতোক্ষণ ভারত ত্যাগ ক'রে না যায়, ততোক্ষণ স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে রাখা। আমাদের এই অভিযানের শেষ দিনগুলিতে দুঃখ ও বেদনার অন্ত থাকবে না। চলবে পীড়ন, অত্যাচার; চলবে শাসন; চলবে হত্যা। কিন্তু সে হোলো মুক্তির মূল্য, তা না দিয়ে আমাদের উপায় নেই। এটা খুবই স্বাভাবিক যে অন্তিম কালে বৃটিশ সিংহ একবার কর্ণে কামড় দেবে; কিন্তু যতোই হোক, সে কামড় মুমূর্ষু সিংহের, তাতে আমরা মরবো না।

"বন্ধুগণ! এই সংকট মুহূর্তে সমস্ত ফলাফল উপেক্ষা ক'রে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের বর্তমান যুদ্ধের রীতি। যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য অচিরেই ভেঙে খসে পড়বে। অবশেষে এই সাম্রাজ্য যখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে, তখন আপনা থেকেই ক্ষমতা চ'লে আসবে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে। আমাদের চূড়ান্ত জয় আসবে কেবলমাত্র আমাদের চেষ্টার মধ্য দিয়েই। সুতরাং আজ আমরা, ভারতীয়েরা যদি সাময়িকভাবে পিছু হটে আসতে বাধ্য হই, বিশেষত মেশিনগান, বোমা, ট্যাঙ্ক ও বিমানের সামনে, তাতে কিছু যায় আসে না। আজ আমাদের কাজ হোলো যতোক্ষণ না স্বাধীনতা আসে, ততোক্ষণ সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও জাতীয় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

"সেচ্ছায় কারাগারে, তাই ভয় পাবার, হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বরং, তাঁদের দুঃখ বেদনা, তাঁদের নির্যাতন আজ সমগ্র জাতির কাছে চিরন্তন প্রেরণা নিয়ে আসবে। গত বিশ বছর ধ'রে আমি এমন কি যখন সবাই জেলে, তখনো অভিযান চালিয়ে আসতে চেয়েছি। শুধু তাই নয়, আজ যাঁরা আপনাদের সংগ্রাম থেকে দূরে, তাঁরা আপনাদের সংগ্রাম চালাবার পদ্ধতি ও পরিকল্পনা দিয়ে গেছেন। যে-পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার ভার কেবল আপনাদের।

'বন্ধুগণ! আমি আগেই আপনাদের জানাচ্ছি যে, আমি বিদেশ থেকে যাই করিনা কেন, তা দেশের বিরাট অংশের ইচ্ছা অনুসারেই করছি। সারা ভারতবর্ষ পূর্ণোদ্যমে যা সমর্থন করবে না, এমন কিছুই আমি করবো না। দেশ থেকে চ'লে আসার পর ভারত সরকার এবং বৃটিশ সরকার উভয়ের গোয়েন্দা বিভাগের প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও, আমি একাধিক উপায়ে আমার দেশবাসীর সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেছি। ভারতবর্ষে স্বদেশবাসীর সংগে আমার যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, তার প্রমাণ আপনারা গত কয়েক মাসে পেয়েছেন। এবং আপনারা ইচ্ছা করলে, আমার সংগে কিভাবে যোগাযোগ রাখতে পারেন, তাও হয়তো এখন আপনাদের অনেকের কাছে অজানা নেই। "আজাদ হিন্দ রেডিও" এবং আমার সম্বন্ধে ভারত সরকারের কয়েকটি গোপন রিপোর্ট আমি দেখেছি। সেগুলি দেখে আমি না হেসে পারি নি। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ যদি ভাবে যে আমার সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, তবে আমি [illegible]। কিন্তু একদিন আমার সংগে যে তাদের মরণ বাঁচনের যুদ্ধ করতে হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই প্রসংগে আমি বৃটিশ সরকারকে জানাই, যে, তারা যুদ্ধের যে সকল নানা কৌশল শত্রুর দেশে কাজে লাগাচ্ছে, আমাদের লোকেরা সেগুলিকে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, এবং দেখা গেছে, সেগুলি আমাদের প্রয়োজন মত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চূড়ান্তভাবে প্রযোজ্য। আর, একথা জানিয়ে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

"বন্ধুগণ! বর্তমান সময়ে সমস্ত দেশ,—বৃটেন যাদের শাসন করেছে, পীড়ন করেছে, হয় তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, নয় বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ভারতে আমরা যদি আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাই, তবে আমরাই শুধু জন্য স্বাধীনতা লাভ করবো না, অন্যান্য দেশ, বৃটেন যাদের শাসন ও শোষণ করছে, তাদেরকেও মুক্তির পথে এগিয়ে দেবো। অপর পক্ষে, ভারত যদি নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে বৃটিশের যারা শত্রু, তারাই ভারত থেকে বৃটিশদের তাড়িয়ে দেওয়ার ভার নেবে। যে-কোনো অবস্থাতেই হোক, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন প্রশ্ন হোলো, যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে, তখন কি দশা হবে আমাদের। এই শক্তির কাছ থেকে আমাদের স্বাধীনতা আমরা দান হিসাবে নেবো, না, আমরা জয় করবো আমাদের স্বাধীনতা আমাদের শক্তি ও চেষ্টা দিয়ে? মিঃ জিন্না, সাভারকর এবং অন্যান্য নেতারা, এখনো যাঁরা বৃটিশের সংগে আপোষ-মীমাংসার কথা ভাবেন, তাঁদের আমি এই কথাটুকু বুঝতে অনুরোধ করি যে, কালকের পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্য ব'লে কিছু থাকবে না। যে সকল ব্যক্তি, যে সমস্ত দল, যে সমস্ত সম্প্রদায়, আজ স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন, আগামী কালের ভারতবর্ষে তাঁদের আসন হবে শ্রদ্ধায়, সম্মানের। আর আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক যাঁরা সেদিন তাঁদের অস্তিত্বও থাকবে না। এই প্রসংগে আমি সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করছি, তাঁরা যেন একথা ভেবে দেখেন এবং আজ যে মহাসংগ্রাম চলছে, তাতে যোগ দেবার জন্যে সবাই এগিয়ে আসেন। মুসলিম লীগের প্রগতি-শীলদের, যাঁদের কয়েক জনের সংগে আমার ১৯৪০ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজে সহযোগিতা করার সুযোগ ঘটেছিল, তাঁদের কাছেও আমি আবেদন করছি। আমি আবেদন করছি সেই ভারতের জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল, [illegible] মজলিস-ই অহ্‌রারের কাছে,—যাঁরা অন্যান্য সকল দলের আগেই বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালে আইন অমান্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক নেতা মুফ্‌তি কিফায়াৎ উল্লার নেতৃত্বে পরিচালিত উলেমাদের

[illegible] প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের এবং ডাঃ [illegible] নিকটেও আমি আমার আবেদন জানাচ্ছি। অন্যতম জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের অন্যতম মুখ্য প্রতিষ্ঠান আজাদ (স্বাধীন) মুসলিম লীগের কাছেও। আমি আবেদন জানাচ্ছি অন্যতম জাতীয়তাবাদী শিখদের প্রধান দল 'আকালী-দলকে'। অবশেষে, অবশেষে হলেও অবহেলার নয়—আমি আবেদন জানাচ্ছি যারা দেশের বিপ্লবাত্মক এবং সুপরিচিত দেশপ্রেমিকদের দ্বারা পরিচালিত বাংলার প্রজা পার্টির কাছে। যদি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এই সংগ্রামে এসে যোগ দেয়, তবে আমাদের মুক্তির দিন যে এগিয়ে এসেছে, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

ভারতে যে-সংগ্রাম আজ চলছে, তাকে অহিংস গেরিলা যুদ্ধ বলা যেতে পারে। এই গেরিলা যুদ্ধে ছত্রভঙ্গের নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের কর্ম-ব্যবস্থাকে এমন ভাবে সমগ্র দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে, যাতে বৃটিশ পুলিশ বা সামরিক বাহিনী কোনো একটি জায়গায় তাদের আক্রমণ না জমিয়ে তুলতে পারে। গেরিলা যুদ্ধের নীতি অনুসারে, আমাদের কর্মকেন্দ্র চলমান হ'তে হবে, এবং ক্রমাগতই একস্থান থেকে আর এক স্থানে স'রে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারবে না যে, কোথায় কখন আমাদের কাজ শুরু হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন, ১৯২১ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত সমস্ত সংগ্রামেই আমি ছিলাম এবং এই সংগ্রামগুলির ব্যর্থতার কি কারণ, তাও আমি ভালো করেই জানি। গেরিলা যুদ্ধের রাজনীতি ও কায়দা কানুন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কাছে উপদেশ পাওয়ার সুযোগ আমি এখন পেয়েছি। তাই কি ভাবে বর্তমান অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করা সম্ভব হবে, সে সম্বন্ধে আমি আপনাদের দু'একটি পরামর্শ দিতে পারি। এই অহিংস গেরিলা যুদ্ধের লক্ষ্য হবে দুটি। প্রথমত, ভারতে যুদ্ধোৎপাদন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, দ্বিতীয়ত, সেখানে বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করা। এই দুইটি উদ্দেশ্য চোখে রেখে দেশের সমস্ত দলকে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমত, গবর্ণমেন্ট যাতে রাজস্ব না পায়, সে জন্যে সরাসরি ভাবে বা অন্য কোনো উপায়ে ট্যাক্সো দেওয়া বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের সমস্ত

(ঙ) পুলিশ সরকারী কর্মচারীদের [illegible] জানানো [illegible] করা।

(চ) যানবাহন ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটাবার জন্যে সরকারী অফিস, কারখানা ও আদালত প্রভৃতিতে হরতাল ক'রে সেগুলি অধিকারের জন্যে শোভাযাত্রা সংগঠন করা।

(ছ) যে সমস্ত রেল কর্মচারী জনসাধারণের উপর অত্যাচার[illegible] করে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

(জ) যে-সমস্ত রাস্তায় পুলিশ বা সৈন্যদের আক্রমণের সম্ভাবনা আছে, সেগুলি প্রতিরোধ ঘটাবার জন্তে বেড়া ও প্রাচীর দিতে শুরু করা।

(ঝ) সরকারী অফিসগুলিতে এবং যে সমস্ত কল-কারখানায় সামরিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, সেগুলিতে আগুন দেওয়া।

(ঞ) বিভিন্ন স্থানে যতো বার সম্ভব ডাক, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা।

(ট) সৈন্যদের যুদ্ধের সরঞ্জাম চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাবার সম্ভাবনা থাকলে রেলপথ, বাস ও ট্রাম চলাচল ব্যাহত করা।

(১) থানা, রেল ষ্টেশন ও জেল ধ্বংস করা।

"বন্ধুগণ! আমি আপনাদের স্থির নিশ্চিত ক'রে বলতে পারি যে, যখনই এই কর্মসূচী কাজে লাগানো হবে, তখনি শাসন-যন্ত্র অচল হ'য়ে পড়বে। এই প্রসংগে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অহিংস গেরিলা যুদ্ধে কৃষাণরা সর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। আমি লক্ষ্য ক'রে খুশী হয়েছি, বিহার, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে কৃষাণরা ইতিমধ্যেই সংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করি, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য কৃষাণ নেতা, যাঁরা ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগে মহাত্মা গান্ধীর পূর্বেই সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, তাঁরা এখন অভিযানকে এক গৌরবময় পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে, যাতে স্বামী সহজানন্দ এবং কিষাণ

বাহিরে গেরিলা যুদ্ধ যদি বেশী দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া যায় তবে স্বাধীনতা আসবে-ই। কারণ, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে পরাজয়ের পালা স্বীকার করছে, তার পুঞ্জিত ফলাফল হিসাবে, অবশেষে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়তে বাধ্য হবে। ভুলে যাবেন না যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের আজ আর দাঁড়িয়ে থাকার মতন শক্তি নেই।

"কিন্তু সেই সংগে আপনাদের সকল দুঃখ যন্ত্রণা ও উৎপীড়নের জন্তে প্রস্তুত থাকতে হবে। কারণ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পয়গম্বর এবং অস্তনাস্তিক সনন্দের জন্মদাতারা ভবিষ্যতে তাঁদের সাধ্য মতো অনিষ্ট ঘটাতে পারেন। প্রভাতের পূর্ব মুহূর্তগুলিই সব চেয়ে বেশি অন্ধকার। সাহসের সংগে সংগ্রাম চালিয়ে যান, স্বাধীনতা এলো ব'লে। আপনাদের বিপ্লবের বাণী হোক, 'হয় এখন, নয় কখনো না'; 'জয় অথবা মৃত্যু'; 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।"

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ

[১৯৪২ সালের ১৫-ই অক্টোবর তারিখে বার্লিন থেকে বেতার-বক্তৃতা]

"স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ! গতবার বেতারে বক্তৃতা দেওয়ার পর আমি ইউরোপের অন্য এক অংশে চলে গিয়েছিলাম—সেখানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার এবং সেখানে আমাদের যে-সব স্বদেশবাসী আছেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে। বার্লিনে ফেরার পর, সমস্ত পৃথিবীতে আমার স্বদেশবাসিগণ যে যেখানে আছেন, তাঁদের বলবার জন্যে আবার আমি শর্ট-ওয়েভ স্টেশনের আতিথ্য-গ্রহণ করছি। আমি তাঁদের সমক্ষে আজ পৃথিবীর পরিস্থিতি কি তা উত্থাপন করতে চাই—যাতে তাঁরা সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝে ভবিষ্যতে আমাদের কর্তব্য কি নির্ধারণ করতে পারেন।

"কি দেশে, কি বিদেশে, প্রত্যেক ভারতীয়ের বোঝা দরকার যে, এই সময়ের মধ্যে সামরিক পরিস্থিতি যাই হোক, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে বৃটেনের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থাটা আদৌ ভালোর দিকে এগোয় নি। আজকে এমন একজন-ও ভারতীয় নেই, যিনি বিশ্বাস করেন যে, যদি বৃটেন দৈবাৎ যুদ্ধে জয়লাভ করে তবে তার ফলে ভারতের অবস্থার কিছু উন্নতি হবে। কিন্তু আমি জানি, দায়িত্বশীল এমন বহু ভারতীয় আছেন, যাঁরা একদিন বিশ্বাস করতেন যে যুদ্ধে বৃটেনের যদি গুরুতর ক্ষতি হয়, তবে তারা তাদের মনোভাব বদলে ভারতের সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসার কথা ভেবে দেখবে। কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নি। কারণ, চার্চিল বা আমেরির মতো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মন অদ্ভুতভাবে কাজ করে, তাদের রাজনৈতিক কলাকৌশলও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ব থেকে-ই এই সাম্রাজ্যবাদীরা

স্থির ক'রে রেখেছে, তারা ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবীর কাছে কিছুতেও মাথা নোয়াবে না। বর্তমান অবস্থার প্রয়োজন অনুসারে তারা বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, এবং পরে, পূর্বের চেয়েও অধিক পরিমাণে ভারতবর্ষকে শোষণ ক'রে করবে সেই ক্ষতির পূরণ। এই কারণেই, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মতো গণতান্ত্রিক রাজনীতিকগণ, যাঁরা ভারতের সঙ্গে কোনো প্রকার বোঝাপড়া করার সুপারিশ করেছিলেন, বৃটেনের সমর মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের বিতাড়িত করা হ'য়েছে।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায়ের অনুসৃত নীতিটা আজ সমগ্র জগতের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। এই নীতিকে গোপন রাখারও আর চেষ্টা চলছে না। এই নীতি কি তা বুঝতে হ'লে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের কথাবার্তা শুনলেই যথেষ্ট হবে। তারা দাবী করেছে যে, ভারতবর্ষ আজ মার্কিন প্রভাবান্বিত এলাকার মধ্যে রয়েছে এবং এই ব্যাপারটি বৃটিশ সহ অন্যান্য শক্তিদেরও স্বীকার ক'রে নিতে হবে। কিন্তু অদ্ভুত, বৃটিশ রাজনীতিকদের মধ্যেও একদল লোক ইতিমধ্যে দেখা দিয়েছেন, যাঁরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করছেন যে আজ বৃটেনের স্থান হোলো অধীনস্থের স্থান; তাঁরা ঘোষণা করছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর নেতা, এবং তা অবিসংবাদিত সত্য এবং এই সত্যকে বৃটেনকে মেনে নিতে হবে এবং সাম্রাজ্যকে আগলে রাখার জন্যে চেষ্টা করতে হবে যে কোনো উপায়ে। বৃটিশ রাজনীতিকগণ যে আগেভাগেই তাঁদের পরাজয়কে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, এর চেয়ে বৃটিশ শিবিরে মনোবল বিনষ্টের নির্ভুল লক্ষণ আর হয় না। নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দৃশ্যটি আজ বড়ো কৌতুকাবহ। কারণ, আজ এক অংশে নিতান্ত অনিচ্ছার সংগে একটি বন্দর স'পে দিতে হচ্ছে শত্রুকে, অপর অংশে স্বেচ্ছায় আর একটি বন্দর তুলে দিতে হচ্ছে বন্ধুর হাতে।

"গত যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট উইলসন যে ভুল করেছিলেন, এবারে প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট সে ভুল করছেন না। তিনি বিনা লাভে বৃটেনকে যুদ্ধের মালমশলা এবং আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন না। তাঁর গভর্ণমেন্ট সর্বত্র নগদ মূল্যের বদলে

পীড়াপীড়ি করছে; ফলে পৃথিবীময় বৃটিশের সম্পত্তি আজ বাজারে উঠে যাচ্ছে এবং আমেরিকানরা গ্রহণ করছে তাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের বহু সামরিক ঘাঁটি দখল করছে। যুদ্ধের শেষে স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ফের এই ঘাঁটিগুলি বৃটেন বা ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দেবে, একথা ভাবার মতন নির্বোধ কে আছে? বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্রই আজ মার্কিন সৈন্যদের দেখা যাচ্ছে, এমন কি, ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড তাদের অধীনে রয়েছে। আবার কয়েকটি জায়গায়, যেমন অষ্ট্রেলিয়া কি নিউজীল্যাণ্ড, বৃটিশ সৈন্যরা রয়েছে মার্কিন হুকুমতের অধীনে। অর্থাৎ, আমেরিকা ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য অধিকারের কাজ ক'রে চলেছে।

"এই সামরিক অধিকারের কাজ যখন একদিকে এগিয়ে চলেছে, তখন আমেরিকানরা অন্যদিকে রাজনীতির ক্ষেত্রেও ক্রমাগত নিজেদের দাবী জোরের সংগে সংগে করছে ব্যক্ত। আমেরিকানদের দাবীর একটি জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ হোলো, ইংল্যাণ্ডে এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে মার্কিন সৈন্যরা স্থানীয় আইনের অধিকারের বাইরে। তারা সরাসরিভাবে ওয়াশিংটনের অধীনে এবং সরাসরিভাবে মার্কিন আইন-কানুনের এলাকায় পড়ে। ফলে, দীর্ঘকাল ধ'রে বৃটিশরা চীন, মিশর ও অন্যান্য দেশে যে সমস্ত অতি-দেশিক (extra-territorial) ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ ক'রে এসেছিল সেগুলিকে আজ ভোগ করছে আমেরিকানরা।

"বৃটিশের ক্ষতির মূল্যে আজ আমেরিকানরা কিভাবে নিজেদের দাবী জাঁকালো জাহির করছে, তার সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ: এংলো আমেরিকান কোম্পানির ছোট শরিকের শত আপত্তি সত্ত্বেও উত্তর আফ্রিকাতে জেনারেল দ গলের জায়গায় জেনারেল দ গলের ও তাঁর সমস্ত দাবীকে অস্বীকার উপেক্ষা ক'রে হোয়াইট হলের পোষ্য এডমিরাল দার্লাঁকে ঠাঁই দেওয়া। যেদিন যখন বি. বি. সি. থেকে জানানো হোলো যে, প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বৃটিশ সামরিক কর্তাদের একজন আমেরিকান, জেনারেল আইসেনহাওয়ারের

আদেশ পালন ক'রে চলতে হবে, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইলো না।
সত্যই, হোয়াইট হলের মালিক যে এইভাবে বৃটিশ সিংহকে একটী মেষে পরিণত করতে পারেন, তা মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু প্রত্যক্ষকে অবহেলা করার উপায় নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পাছে রাগ করেন, এই জন্যে একদা-পরম-পরাক্রান্ত বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রকাশ্য অধিবেশনে দাকা'র কাহিনীটি সম্বন্ধে আলোচনা পর্যন্ত করতে সাহস পেলেন না।

"আর ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার স্বদেশবাসিগণ জানেন, সেখানে মার্কিন সৈন্যবাহিনী, মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন ও মার্কিন কূটনীতিকগণ ইতিপূর্বেই গিয়ে হাজির হ'য়েছেন। এখন আমেরিকানরা প্রকাশ্যে বলতে শুরু করেছে যে, ভারতে অবস্থিত আমেরিকানরা লণ্ডনের অধীনে নয়, তারা ওয়াশিংটনের অধীনে। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হোয়াইট হাউস ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে কোণ ঠাসা ক'রে ভারতের উপর নিজেদের আধিপত্য দৃঢ় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অবশ্য চার্চিল এমেরি ও তাঁদের সহকর্মীরা হোয়াইট হাউসের সকল প্রকার অপমান লাঞ্ছনা মাথা পেতে নিচ্ছে, তার একমাত্র কারণ বৃটীশ সাম্রাজ্যকে তারা কোন রকমে রক্ষা করতে পারবে, এই তাদের আশা। কিন্তু কূটনীতিক চালের দিক থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উন্নততর জীব। তিনি বৃটীশ রাজনীতিকদের এই হীন বশ্যতা ও আত্মসমর্পনকে ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে, বৃটীশ সাম্রাজ্যকে সমূলে আত্মসাতের দিকে এগিয়ে চলেছেন, নিষ্কম্পভাবে। তিনি তাই এখন তাঁর দূত হিসাবে ভারতে পাঠিয়েছেন মিঃ উইলিয়াম ফিলিপস্‌কে। কারণ, ভারতে বৃটিশ বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর রাজ্য শাসন তাঁর মনোমতো হচ্ছে না। পুরাতন জীর্ণ জড় মাস্টারের স্থলে ভারতবর্ষ এবার একজন নতুন মনিব পাবে। বর্তমানে কিছুদিনের জন্যে মিঃ ফিলিপস্ বৃটিশ সিংহাসনের পেছনে থেকে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে খুশী থাকবেন। কিন্তু যদি মার্কিন পরিকল্পনা টিকে যায় এবং কোনো ক্রমে এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র জয়লাভ করে, তখন মিঃ ফিলিপস্ প্রকাশ্যে দিল্লীর বড়লাটের স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে বসবেন। কিন্তু একজন বৃটীশ

বৃটেনের বদলে তাঁর জায়গায় একজন আমেরিকান প্রো-কনসালকে আবার বসাতে ভারতবর্ষ চায় না। সুতরাং, ভারতবর্ষে মার্কিন আতংক যতোক্ষণ বিন্দুমাত্রও থাকবে, ততোক্ষণ তার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।

"স্বদেশবাসিগণ ও বন্ধুগণ! বৃটিশ সাম্রাজ্য, তথা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আজ যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ক'রে লাভ নেই। আমরা কৃতজ্ঞতার সংগে স্বীকার করছি, আমেরিকার জনসাধারণের একটি বড়ো অংশ ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সহানুভূতি দেখান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাঁদের নিজেদের গভর্নমেন্টকে প্রভাবান্বিত করার মতো ক্ষমতা তাঁদের নেই। ভারত সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে নীতির অনুসরণ করছে, তা বৃটেনের মতোই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রসূত। যদি হোয়াইট হাউস সত্যই ভারতকে স্বাধীনতা দিতে চাইতো, তবে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে বাধ্য করতো হোয়াইট হলকে। কিন্তু তা না ক'রে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ষ অধিকারের কাজ চালাচ্ছে। এবং এখন মিঃ ফিলিপস্ আবার ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে ভারতীয় জনসাধারণের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করবেন,—যার ফলে যথাসময়ে তিনি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের লর্ড লিনলিথগো ও বৃটিশ বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত ক'রে ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করতে পারেন। স্বদেশবাসিগণ! মিঃ ফিলিপস্ সম্বন্ধে সাবধান হোন। তাঁকে বয়কট করুন।

"এক্সিস-শক্তি যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে, তবে পৃথিবীর যে কী শোচনীয় পরিণাম হবে, সে সম্বন্ধে এংলো-মার্কিন প্রচারকরা ব্যাপকভাবে প্রচার-অভিযান চালাচ্ছে। ছোট-খাটো জাতি ও ছোট-খাটো সম্প্রদায়ের কথা ভেবে তাদের কুমীরের কান্নার অন্ত নেই। কিন্তু আমরা, পৃথিবীর মনুষ্যজাতির এক-পঞ্চমাংশ, ভারতের জনসাধারণ,—আমরা জানি, যদি দৈবাৎ এই যুদ্ধে তথাকথিত সম্মিলিত জাতির জয়লাভ ঘটে, তবে আমাদের কি অবস্থা হবে। যে আতলান্তিক সনদের কথা আমরা এতো শুনছি, সেই অতলান্তিক সনদ গত যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট

উইলসনের 'চৌদ্দ দফার' মতোই কয়েকটা কাগজের অর্থহীন টুকরা মাত্র। শুধু তাই নয়, এই কাগজের টুকরোগুলি যে ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রযোজ্য, একথাও সরকারীভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ এখনো মার্কিন শক্তি আর ভারতে প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতো এক সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ করছে।

"যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্তে বৃটিশেরা কয়েকটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। এবং যদি বৃটিশ রাজনীতিকেরা এই পরিকল্পনা কাজে লাগাবার মতন সুযোগ সুবিধা পায়, তবে তারা ভারতবর্ষকে চারটি কি পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করবে এবং যুদ্ধে যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণের জন্তে একটি কড়া সাম্রাজ্যবাদী সরকারের অধীনে আজ পর্যন্ত যা হয়েছে তার চেয়েও অধিকতর তীব্রভাবে শোষণ চলবে। তখন য়ুনিয়ন জ্যাক আজকের মতো কেবল যে ভারতের রাজধানীর ওপর উড়বে, তা নয়, তা উড়বে হিন্দুস্থানের রাজধানীতে, পাকিস্থানের রাজধানীতে, এবং পাঠানীস্থানের রাজধানীতে। বৃটিশ তখন ভারতবর্ষের জনসাধারণকে দাসত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেবে। মিঃ জিন্না এবং তাঁর মুসলিম লীগকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে বলি।"

এখন আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার, যদি হোয়াইট হাউস এবং ওয়াল ষ্ট্রীট বৃটিশ সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন হ'তে বাধ্য করে এবং যদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট 'পৃথিবীর পরিচালক' নিযুক্ত হন, তবে ভারতের কি অবস্থা হবে। বর্ত্তমানে মার্কিন সরকার যে সব নীতি ও রীতির অনুসরণ করছেন, আমরা তাতেই তার নমুনা পাচ্ছি। চীনদেশ যাতে তার দ্বার উন্মুক্ত রাখে, মার্কিন সরকার সেজন্ত সেখানে পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি চীন, কি জাপান, কি ভারতবর্ষ বা অন্যান্য এশীয় দেশগুলির জনসাধারণের জন্তে দেশবাসীদের বসবাস নিষিদ্ধ কেন? বহুসংখ্যক ভারতীয়, যারা দীর্ঘকাল ধ'রে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বসবাস করছিল, তারা নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে কেন? যদি অতলান্তিক সনদে মানবতার বিন্দুমাত্র অর্থ বা ইংগিত থাকে, তবে ভারতের এই অপমান অবিলম্বে দূর করা কি প্রয়োজন নয়? যদি আমেরিকার শাসক

সমস্যায় অন্যান্য দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠদের কথা ভেবে কুম্ভীরের কান্না কাঁদতে থাকে, তবে নিজেদের ঘর সামলানো কি সবার আগে তাদের উচিত নয়? এমন কি আজো যে নিগ্রো নির্যাতন আমেরিকায় চলে, তা তারা বন্ধ করে না কেন? 'পল টাক্স' কিংবা অনুরূপ অসুবিধা, যাতে আমেরিকান নিগ্রোরা আজ ভুগছে, সেগুলি তারা দূর করে না কেন? যে স্বাধীনতা, সভ্যতা ও গণতন্ত্রের বুলি তারা মুখে আওড়ায়, তা যদি তারা সত্যই স্বীকার করে, তবে তাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে নিগ্রোরা যে সমস্ত সামাজিক অসুবিধা ভোগ করছে, সেগুলির কোনো ব্যবস্থা করে না কেন?

স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ! গতবারে আমাদের শত্রুরা যে শেষ অস্ত্রটি ব্যবহার করেছিল, সেটি আবার তারা ব্যবহার করতে চায়, এ কথা আপনাদের জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। সেই শেষ অস্ত্রটি ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জার্মান শত্রুদের বিরুদ্ধে নৃশংসতার কাহিনী প্রচার করা। সেই সময় বৃটিশ প্রচারকেরা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ভয়াবহ কাহিনীগুলি প্রচার করতো, জগৎ আজ তা ভুলে যায় নি। গত যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ প্রচার সম্বন্ধে সুখ্যাত বৃটিশ প্রচারকদের লেখা 'Figures,' 'Crewe House' এবং 'Wartime Falsehood'-এর মতন বই কে না পড়েছে? যুদ্ধের সময় শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে ইচ্ছা ক'রে শয়তানি ক'রে মিথ্যা প্রচার করতো এ সম্বন্ধে যুদ্ধের পরে জেনারেল চার্টারিস প্রভৃতির স্বীকৃতির কথা কে আজ ভুলে গেছে? অভিজ্ঞতার ফলে পৃথিবী আজ আগের চেয়ে হয়েছে বুদ্ধিমান। তাছাড়া বেতার যন্ত্রের উন্নতির ফলে বৃটিশ প্রচারের মিথ্যাবাদিতা পদে পদে প্রমাণ ক'রে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। আমি মনেপ্রাণে জানি, ভারতবর্ষে নৃশংসতার এই প্রচার আদৌ কার্যকরী হবে না। সম্ভবত অন্যান্য সবার চেয়ে ভারতীয়েরা ভালো ক'রেই জানে, বৃটিশ আধিপত্যের অর্থ কি। ভারতে বৃটিশ শাসনের পত্তন করেছিল সেই রবার্ট ক্লাইভ, ইতিহাস যাকে জালিয়াৎ ব'লে নিঃসন্দেহে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি,

তা গড়ে উঠেছিল জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতা ও জুয়াচুরির ওপর ভিত্তি ক'রে। দীর্ঘকাল ধ'রে ক্ষমতা লাভের জন্যে ভারতবর্ষে বৃটিশেরা যে যুদ্ধ করেছে, তাতে এমন নিষ্ঠুরতা নেই, এমন নৃশংসতা নেই, যা তারা অনুষ্ঠিত করে নি। কে না জানে যে, আমাদের ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় বহু নির্দোষ লোককে হাতে পায়ে বেঁধে কামানের তোপে উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল! ১৮৫৭ থেকে আজ পর্যন্ত, দেশে যখন শান্তির ব্যতিক্রম ঘটেনি, তখনো বৃটিশ পুলিশ ও সামরিক বিভাগ জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বহু ভয়াবহ নৃশংসতার অনুষ্ঠান করেছে। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালা বাগে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সরকারী রিপোর্টে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও বৃটিশ সৈন্যদলকে অমানুষিক নৃশংসতা, ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড এবং নিরুপায় নারীদের উপর নিগ্রহ প্রভৃতি সকল প্রকার নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সম্বন্ধে অভিযুক্ত করা হ'য়েছিল। এবং এমন কি ১৯১৯ সালের পরেও বৃটিশ পুলিশ ও সৈন্যেরা ভারতীয় পুরুষদের জীবন ও স্ত্রীলোকদের সম্মানকে 'খেলনার মতন দেখে এসেছে। ১৯৩০ সালের বাংলায় মেদিনীপুর জেলার লোকেরা শান্তিপূর্ণভাবে "ট্যাক্স বন্ধ" অভিযান চালাচ্ছিল সেই কারণে যখন তাদের বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল, মেয়েদের ওপর করা হ'য়েছিল লাঞ্ছনা, নির্যাতন, তখন যে দুঃখ-যন্ত্রণা তারা ভোগ করেছিল, আজ ভারতবর্ষের কে সে কথা ভুলে গেছে? ১৯৩১ সালে হিজলীর বন্দী-শিবিরে, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান হ'য়েছিল, বাংলার ঘরে ঘরে আজো তার স্মৃতি জেগে রয়েছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, বার্মায় বৃটিশ টমিরা বৃটেনে তাদের পরিবারের কাছে ছিন্নশির বর্মীদের যে-সব ফটো পাঠাতো, তাও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এ ধরণের নৃশংসতা কেবল বৃটিশ টমিদের পক্ষেই সম্ভব। স্বাধীনতা দাবী করার অপরাধে আজ বৃটিশ পুলিশ ও বৃটিশ সৈন্যেরা নিরস্ত্র আবালবৃদ্ধ নরনারীর ওপর যে নৃশংসতার অনুষ্ঠান করছে, পৃথিবীর ইতিহাসে কি তার তুলনা আছে? নৃশংসতার খেলায় যারা নিজেরা এমন

শিখেছে, অন্য কারো বিরুদ্ধে নৃশংসতার অভিযোগ তাদের মুখে শোভা পায় না।

"এ্যাংলো-মার্কিণ সাম্রাজ্যের পতনের উপরেই ভারতের মুক্তিলাভের সকল আশা-ভরসা নির্ভর করছে, এ-কথা ছেড়ে দিলেও, ঘটনার পর্যবেক্ষক হিসাবে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, এই যুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ পতন ঘটবে। এই সাম্রাজ্যের কোনো অংশ সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের দিকে চ'লে পড়বে। বহু অংশ চিরকালের জন্তে নিজেদের মুক্ত করবে এবং কোনো কোনো অংশ অন্যান্ত শক্তির হাতে চলে যাবে। সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর সভাপতিত্ব করার ইচ্ছা মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের নেই; এ-কথা তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সংগেই বলেছেন, স্বীকার করি। কিন্তু যে-নীতির তিনি অনুসরণ করেছেন, তাতে সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য। যতোদিন মিঃ চার্চিল হোয়াইট হলে বিধিব্যবস্থার কর্ণধার হিসাবে বর্তমান থাকবেন, ততোদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার পথে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার যে কোনো সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। সুতরাং আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি, ভারত তথা সমগ্র মানবতার কল্যাণের জন্তে যতোদিন পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে না আসে, ততোদিন পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের ভাগ্য-নিয়ন্তা হিসাবে মিঃ চার্চিলই যেন বর্তমান থাকেন।

"এই যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয় ঘটবে এবং এক মুক্ত স্বাধীন ভারত মূর্তিগ্রহ করবে, আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস কোনো ইচ্ছা প্রণোদিত চিন্তার ফলে জন্মে নি। গত যুদ্ধের সময় যা ছিল না, তেমনি একটি বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ এই যুদ্ধে এ্যাংলো মার্কিণ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গ'ড়ে উঠেছে। বার্লিন-রোম-টোকিও চুক্তির ফলে বৃটেনের আজ, না আতলান্তিকে, না ভূমধ্যসাগরে, না প্রশান্ত মহাসাগরে, কোথাও শান্তি নেই। বৃটেনের নৌ-শক্তির মূল চ'লে গেছে। গত যুদ্ধের সময় যে 'ব্লকেড' ব্যবস্থা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারিত করেছিল, আজ সেই 'ব্লকেড' ব্যবস্থা বৃটেনের অতুলনীয় নৌশক্তি সত্ত্বেও তারই নিজের

বিরুদ্ধেই কাজ করছে। তার ফলে আজ ইওরোপীয় মহাদেশাঞ্চলের চেয়ে বৃটেনের ঘাড় সমস্যা হ'য়ে উঠেছে অধিক গুরুতর। ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরো অনেক বেশি গুরুতর হ'য়ে উঠবে। যুদ্ধের রীতিতে এখন এমন বিপ্লব ঘটে গেছে, যার ফলে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তিগুলির অসুবিধাই হচ্ছে। সমস্ত যা গত যুদ্ধে বৃটেন ও মিত্রশক্তির সহায়তা করেছিল, আজ তা-ও তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ইওরোপে এবং এশিয়ায় এ্যাংলোমার্কিণ শক্তিগুলির পরম পরাজয় ঘটেছে। যুদ্ধের ভবিষ্যৎ কি, তা সেখানেই নির্দিষ্ট হ'য়ে গেছে চূড়ান্তভাবে। তাদের কি রকম মরিয়া অবস্থা, তা এ্যাংলোমার্কিণ শক্তিগুলি এবং তাদের প্রচারকেরা ভালো ক'রেই বোঝে। তাই পৃথিবীর দৃষ্টি যা'তে এই ভয়ানক সত্য থেকে অন্যত্র গিয়ে পড়ে, তার উদ্দেশ্যে তারা পরাজিত ও নিরুপায় ফরাসী সাম্রাজ্যের ঘাড় ভেঙে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় একটা অভিযান শুরু ক'রে দিয়েছে। সামরিক লাভের চেয়ে এই প্রচারই হোলো এই অভিযানের বড়ো লক্ষ্য। তাই এই অভিযান শুরু হবার সংগে সংগেই প্রচারের কাজও পূর্বের চেয়ে তীব্র হ'য়ে উঠেছে। এক সময় বি, বি. সি, থেকে প্রায়ই বলা হোতো যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবে। তারপর তারা বলতে আরম্ভ করলো, তাদের রক্ষা করবে সেনাপতি টীমোশেঙ্কোর সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়া। কিন্তু এদিন যখন এ ব্যাপারটিকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে দিলো, তখন বি. বি, সি, আবার বলতে বেরিয়েছে, আফ্রিকার লড়াই-ই যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দেবে। এই সব ব্যাপার থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত না ক'রে উপায় নেই যে, এ্যাংলো-মার্কিণ শক্তিগুলি আজ ওয়াকিবহাল তাদের যতোই মিথ্যা প্রচার করুক না কেন তারা এক অনিবার্য চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্মুখীন হ'য়েছে। তাদের ধ্বংস অনিবার্য; তারা ধীরে ধীরে পূর্ণ পরাজয়ের পথে এগিয়ে চলেছে।

"এই অবস্থায়, আমরা ভারতীয়েরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের শেষ যুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি-সম্পদ নিয়োগ করবো। বৃটিশেরা দেড়শ বছরের বেশি আমাদের দেশ শোষণ ক'রে এসেছে, আজ তারা কঠিন অবস্থায় এসে

পৌঁছেছে। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই দুর্যোগই হোলো ভারতের সুযোগ। আজ আমরা যদি আমাদের সমস্ত শক্তি ও সংকল্প দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদে কঠিন আঘাত হানতে পারি, তবে আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আমরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি বিলুপ্ত ক'রে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবো।

এই যুদ্ধই হ'তে পারে আমাদের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ। এবং আমি আশা করি, বিশ্বাস করি, এই যুদ্ধের ইতিহাস যখন পরবর্তীকালে লিখিত হবে তখন, একথা বলা সম্ভব হবে যে এই যুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্রই ভারতবাসীরা অংশ গ্রহণ করেছিল।

অবশেষে, আমি আমার বাংলার স্বদেশবাসীদের সতর্ক ক'রে দিতে চাই যে শীঘ্রই তাঁদের দুর্দিন আসছে। পূর্ব অঞ্চলে রক্তপাত ঘটবে প্রচুর। কিন্তু সেই রক্তপাতকে আমার স্বদেশবাসীদের ভয় করলে চলবে না। বাংলাই ভারতে বৃটিশ শাসনের পত্তন করেছিল, এখন বাংলাকেই আবার তার উচ্ছেদ করতে হবে।

অতীতকালে বৃটিশেরা ভারতবর্ষকে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের ও অধিকারের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করেছিল। ভারতের সম্পদই ছিল তার সহায়। বৃটিশ আজ ব্রহ্ম থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এখন তাই সে আবার একবার ভারতবর্ষকে, বিশেষ ক'রে বাংলাকে, ব্রহ্মদেশ পুনরধিকারের জন্যে ব্যবহার করতে চায়। এমনি ভাবেই তারা যুদ্ধকে টেনে আনছে ভারতের মাটিতে। সুতরাং বাংলাকে অন্যান্য সমস্ত প্রদেশের আগেই এক সর্বব্যাপী যুদ্ধের বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু এজন্যে বাংলার গর্বিত হওয়া উচিত। পুরোবর্তী বাহিনীর কর্তব্য চিরদিনই কঠিন, কিন্তু তা গৌরবময়ও। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশ তার আগামী কর্তব্যের উপযুক্ত হ'য়ে উঠবে এবং তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পূর্ণ করবে।

আবার একবার স্বাধীনতা-সূর্যের উদয় ঘটবে পূর্বাচলে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!"

ভারতের অবস্থা

[বার্লিন থেকে বেতার-বক্তৃতা, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল]

"আবার একবার সফরে আমি সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত করেছিলাম সম্প্রতি সেসব জায়গায় কী অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করতে দেখেছিলাম। ইউরোপের যেসব অংশকে 'অধিকৃত' অঞ্চল বলা হয়, সেগুলিতেও আমি গিয়েছি। বর্তমান যুদ্ধ বাধার পর স্লোভাকিয়ার মতো যে-সকল নতুন রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে, সেগুলিতেও আমি ঘুরে এসেছি। ইটালির মতো যে সব দেশ অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাতাহাতি সংগ্রাম করছে, তাদের কয়েকটিতেও আমি গিয়েছি। সুতরাং এই মহাদেশে কোথায় কী পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছে, তার নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ অপক্ষপাত বর্ণনা দেওয়ার যোগ্যতা আমার রয়েছে। ভ্রমণকালে আমি সমগ্র যুদ্ধের অবস্থা এবং বিশেষ ক'রে ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এখন আমি বার্লিনে ফিরে এসেছি; তাই যে-অবস্থা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি তা আপনাদের জানাতে এবং দেশে বর্তমানে আমাদের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তার আলোচনা করতে আমি শর্ট-ওয়েভ রেডিও ষ্টেশনের আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

"প্রচার-বক্তৃতা করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। সাধারণ লোকেরা যেমন দায়িত্বহীনভাবে আজে-বাজে কথা বলে, তেমন কোনো বদভ্যাসকেও আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না। আগের মতোই আমি সহজ ভাষায় এবং সাধারণ ভাবেই বলছি। যাঁরা সহজে অধীর হয়ে পড়েন, তাঁরা গত দুই মাসে ঘটনার মন্থর গতি দেখে স্বভাবতই হতাশ হ'য়ে পড়বেন এবং ভাববেন যে গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে অবস্থা মূলত যেমনটি ছিল, এখনো তেমনটি-ই আছে। কিন্তু আমি আপনাদের স্পষ্টভাবেই বলতে চাই, আপনাদের এই ধারণা আমি পোষণ করিনা। বর্তমানে যুদ্ধ এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যখন সময় আমাদের পক্ষে এবং আমাদের শত্রুর বিপক্ষে কাজ করছে। আমরা দেখছি, গত যুদ্ধের সময় জার্মানিকে যে অর্থনৈতিক অবরোধের সম্মুখীন হ'য়ে হয়েছিল, এবার ঠিক

ভেনিস্ হ'তে হ'য়েছে তুর্কীদের। তারপর, বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং বিভিন্নভাবে তার অস্তিত্ব দেশগুলিকে হারাচ্ছে, সেগুলির কোনোটা প্রায় স্বাধীন হচ্ছে, কোনোটা তার বিরোধী হচ্ছে। ফলে, যুদ্ধ যতোই দীর্ঘস্থায়ী হবে, ততোই আমরা দেখবো আমাদের চোখের সামনেই এই বৃটিশ সাম্রাজ্য কেমন ক'রে খসে পড়বে এবং অনিবার্যভাবেই অবশেষে একদিন বিপুল শক্তিশালী বৃটিশ সাম্রাজ্যের ঘটবে বিলুপ্তি। সাম্রাজ্যবাদের প্রধান পুরোহিত মিঃ উইনস্টন চার্চিলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেই একই গতি হবে, যে গতি হ'য়েছে অতীতের সকল সাম্রাজ্যের। এখন কেবল মাত্র একটি সমস্যার সমাধান করতে হবে, সেটা হোলো, এই সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে কারা।

"পৃথিবীর ইতিহাস থেকে আমরা জেনেছি, এই হোলো ভাগ্যের পরিহাস যে যারাই সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে গোঁড়া ভক্ত, সাম্রাজ্যবাদের সমাধিকে ত্বরান্বিত ক'রে দেয় তারাই। ঠিক এমনটি আমরা ভারতবর্ষেও দেখেছি। লর্ড কার্জনের মতো প্রতিক্রিয়াশীল নির্যাতক শাসকেরাই সর্বদা লর্ড রিপন কিম্বা লর্ড আরউইনের মতো তথাকথিত 'ভারত-বন্ধু'দের চেয়ে জাতীয়তাবাদের শক্তিকে বেশি উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করেছে। বাস্তবিক, আমরা ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো যে তিনি আমাদের এই শুভ মুহূর্তে মিঃ উইনস্টন চার্চিলকেই বৃটেনের সকল কর্ম ব্যবস্থার কর্ণধার করে পাঠিয়েছেন। বৃটিশ সরকার ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে কোনো আপোষ-মীমাংসা সম্ভব নয় এবং অনতিবিলম্বে ভারত যে তার স্বাধীনতার লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবে, মিঃ চার্চিলের প্রধান মন্ত্রিত্বই তার সুনিশ্চিত সংকেত। সুতরাং আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনিই যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের শোচনীয় ধ্বংসের চরম মুহূর্ত পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েই বর্তমান থাকেন।

"ইতিমধ্যে সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মতো ডেমোক্র্যাট এবং উদারনীতিকরা যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার পথে সত্যিকারের অন্তরায়, তাঁদের সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। কারণ এই রকম উদারনীতিক ও ডেমোক্র্যাটরাই ভারতীয় জাতীয়বাদীদের বিভ্রান্ত দিশাহারা ক'রে তোলেন। আমরা চাই, সাম্রাজ্যবাদ

তার ট্যাংক্ আর মেশিনগানের ওপর নির্ভর করেছে ভারতশাসন করুক। তার ফলে ভারতীয়েরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ কি এবং বৃটিশের সংগে তারা কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে চাইবে না।

"যাই হোক, গত দুই তিন মাসের মধ্যে যে-সকল সামরিক ঘটনা ঘটেছে, তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থার অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে। মিঃ চার্চিল এবং তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের কথায় বার্তায়, তাঁদের ব্যবহারে, অবস্থাটাকে বেশ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। এখন প্রত্যেক ভারতীয়ই স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন বৃটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি; ভারতীয় দরিদ্রদের কাছে এটলান্টিক সনদ এবং তথাকথিত ইউনাইটেড নেশনসের 'নয়া ব্যবস্থার' অর্থ কি। সুতরাং আজকে প্রত্যেক ভারতীয় স্থির জানতে পেরেছেন—এমন স্থির তাঁরা এর আগে কোনদিনই জানতেন না—যে তাঁদের সম্মুখে স্বাধীনতার একটিমাত্র পথ রয়েছে এবং সে পথ হোলো এই দানবীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরত্বকে সাহায্য করবে। তাতে ভারতের পক্ষে মংগলই হবে, কারণ তখন ভারতের কর্তব্য হ'য়ে উঠবে আরো সহজ। অতএব, ভারতীয় জনসাধারণকে নিজেদের মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে স্বেচ্ছায়, সহিষ্ণুতায়, ত্যাগে নিজেদের মুক্তি অর্জনের পবিত্র শপথ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনো আপোষ-মীমাংসা সম্ভব নয়। একজনের বাঁচতে হ'লে অপরের মৃত্যু অনিবার্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বেঁচে থাকবেই। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু অবধারিত।

"বন্ধুগণ, আমরা যখন দেখছি যে প্রবল শ্রেণীর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা রাজনীতিক বিধিব্যবস্থার সকল ভার হাতে নিয়েছে এবং নিজেদের মনের মতো কাজ করছে, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুনতে পাচ্ছি দুটো সুর। জনসাধারণের একটা বড়ো অংশ ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে সত্যই কৌতূহলী। তাঁরা মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকাশ্যে তিরস্কার করেন। অন্যদিকে, মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্র, কিম্বা শাসনক্ষমতার বল্গা যাঁদের হাতে আছে, তাঁরা যে নীতির অনুসরণ করছেন, তাকে কেবল 'মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ' বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তার ধারা গ'ড়ে উঠেছে, যার মুখপাত্ররা চীৎকার ক'রে ঘোষণা করেছেন যে সমগ্র দুনিয়া হলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের। এই মার্কিণ বিশ্ব সাম্রাজ্যের নীতি অতলান্তিক পারে ইতিমধ্যে-ই প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠছে। কয়েকজন খ্যাতনামা বৃটিশ চিন্তানায়কও এ-ব্যাপারটিকে প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে সমর্থন জানাচ্ছেন। অবশ্য তাঁদের মত এই যে বৃটিশ যেমন রাজনীতিতে আমেরিকার আধিপত্য স্বীকার ক'রে নেবে, আমেরিকাও তেমনি বৃটেনকে তার করতলগত সমস্ত দেশসহ সাম্রাজ্য অক্ষুন্নভাবে বজায় রাখার অধিকার দেবে এবং তার সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না।

"প্রেসিডেন্ট রোজভেল্ট এবং প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের বখরার কারবার শুরু হ'তে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জানেন যে চার্চিল সাহেব তাঁর দুনিয়ার পার্টনার; রোজভেল্ট জানেন, যতোদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ আমেরিকার সাহায্যের ওপর নির্ভর ক'রে থাকবে, ততোদিন মিঃ চার্চিলও তাঁর ফরমাস খাটবেন। আসলে ব্যাপারটা যে কী তা এতোদিনে বুঝতে ভারতীয়দেরও আর বাকী নেই। তাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে তারা যে বিন্দুমাত্রও সাহায্য পাবে, এমন প্রত্যাশা তারা করে না। এবং সম্প্রতি এ্যাংলো আমেরিকান সম্পর্ক যে পথে এগিয়েছে, তাতে তাদের এই ধারণা যে নির্ভুল, তাও প্রতিপন্ন হ'য়ে গেছে। সুতরাং ভারতীয়দের যুদ্ধে ভারতীয়দের নিজেদেরই লড়তে হবে। এবং যদি কোনো বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন ঘটে, তবে সে সাহায্য কেবল মাত্র আসতে পারে এই তথাকথিত ইউনাইটেড নেশনস-এর শত্রুদের কাছ থেকে।

"সমস্ত পৃথিবীতে যে যেখানে আমার স্বদেশবাসী আছেন, এই সম্পর্কে তাঁদের আমি জানাতে চাই, মিঃ চার্চিল এবং বৃটেনের গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক সম্প্রদায় আজকে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পুনর্গঠনের যে খসড়া তৈরী করছেন, তার মধ্যে স্বাধীন

ভারতের তিলমাত্র-ও স্থান নেই। অতলান্তিক সনদে নির্ধারিত নীতিগুলিকে ভারতে প্রয়োগ ক'রে ভারতীয় সমস্যার সমাধান তাঁরা করতে চান না। তাঁরা চান ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে নির্মূল করার জন্যে ক্রূর এবং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে তার সমাধান করতে, যে সমাধানের ফলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে অজ্ঞাত অতীত কাল থেকে যে স্থানগুলি ভারতবর্ষ ব'লে পরিচিত হয়ে এসেছে সেগুলি পরিণত হবে কয়েকটি রাষ্ট্রে এবং এই রাষ্ট্রগুলি আবার সমানভাবে পরাধীন হ'য়ে থাকবে বৃটিশের। আমি জানি আমার কয়েকজন স্বদেশবাসী পূর্বে এই ধরণের মত পোষণ করতেন যে বর্তমান সংকটজনক অবস্থার ফলে বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার ক'রে নেবে এবং এইভাবে ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ভারতবর্ষকে উপযোগী বন্ধু হিসাবে পাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃটিশের চাল এখন এমনকি দশ বছরের যে কোনো ছেলের কাছেও সহজবোধ্য হ'য়ে উঠেছে। মিঃ চার্চিল এবং বৃটেনের শাসক-শ্রেণীর কৃপায় বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের কাছে এখন আর নতি স্বীকার করবে না। যদি কোনো নতি স্বীকার করতে হয় তবে কেবল তা করা চলবে হোয়াইট হাউসের কাছে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বৃটেন যে ত্যাগ স্বীকার করবে, তার ক্ষতি পূরণ করতে হবে ভারতকে শোষণ ক'রে। সুতরাং আগামী কালে ভারতের দুর্গতি আরো দুর্বহ হ'য়ে উঠবে। অর্থাৎ আংকল স্যামের পরিতোষ বিধানের জন্য জন্ বুল্ যখন তার রক্তের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত দিচ্ছে, ভারতবর্ষকে তখন আবার জন বুলকে বাঁচাবার জন্যে তার রক্তের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত দিতে হবে। ফলে যতোদিন পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য বহাল থাকবে, ততোদিন পর্যন্ত মর্মান্তিক গোলামি ছাড়া ভারতের ভবিষ্যতের আর কোনো অর্থই থাকবে না।

"এখন আমার স্বদেশবাসীদের কাছে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে এই কথাকথিত 'ইউনাইটেড নেশন্‌স্' পৃথিবীময় একটা সম্মিলিত যুদ্ধের নীতি গ'ড়ে তোলার মতন একটা কিছুর যেন চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা বের্লিন-রোম টোকিও ত্রিশক্তি কর্তৃক অনুসৃত সম্মিলিত বিশ্বব্যাপী যুদ্ধনীতির সত্তা হবের একটা অনুকরণ

যায়। এই পৃথিবীব্যাপী মিলিত যুদ্ধের নীতি, যার কথা এ্যাংলো আমেরিকানরা এতো ঘন ঘন আওড়াচ্ছে, সেই অনুসারে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তি, বিশেষ ক'রে বৃটেন, ইউরোপে যথাসম্ভব সত্বর একটি দ্বিতীয় যুদ্ধ ক্ষেত্র খোলার পরিকল্পনা করছে। অতি অনিচ্ছা সত্ত্বে, নিতান্ত দায়ে প'ড়েই, এ্যাংলো আমেরিকানরা ইউরোপের কয়েক জায়গায় এর পরীক্ষাও ক'রে দেখেছে, কিন্তু সর্বত্রই তারা হয়েছে বিফল।

"শেষ আশ্রয় হিসাবে, একটা লোকদেখানো দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র খোলার ইচ্ছায়, তারা আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে আক্রমণ করেছিল। এই অঞ্চলগুলি ত্রি-শক্তির রাজ্যের অন্তর্গত নয়, বা যুদ্ধকালে সেগুলি তাদের অধিকারে-ও আসেনি। এগুলি ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলিকে পরাজিত শত্রুর বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসাবে ফরাসীদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সংগে ষড়যন্ত্র ক'রে অসহায় জাতি ও অরক্ষিত অঞ্চলগুলির ওপর এই অতর্কিত আক্রমণকে লণ্ডন এবং নিউ ইয়র্ক থেকে একটা সামরিক কীর্তি ব'লেই ঢাক পেটানো হোলো। নিরপেক্ষ দর্শকেরা এই সামরিক কীর্তিকে মাডাগাস্কার এবং রিইউনিয়ন আইল্যাণ্ড দখলের সমান ব'লেই ভাবেন। মাডাগাস্কার এবং রিইউনিয়ন আইল্যাণ্ড এ-দুটি-ও ছিল ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বৃটেন অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে যে পরাজিত হচ্ছে এবং যেটি হোলো বর্তমান সংগ্রামের সত্যিকারের অর্থ, তাকে গোপন করার জন্যেই তাদের এই সামরিক কীর্তিকে তারা ঢাক পেটাচ্ছে। আসল ব্যাপারের দিকে মানুষের যাতে চোখে না পড়ে, এবং যাতে সোভিয়েট সরকার ইউরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র খোলার জন্যে যে অবিরাম তাগিদ দিচ্ছে সে বিষয়ে তাকে সাময়িক ভাবে খুশী রাখা যায়, সেদিকেই লক্ষ্য রেখে এ-টি করা হচ্ছে। *

"বন্ধুগণ, আজকের পৃথিবীতে আমরা যে অবস্থা দেখছি, এখন আমরা নিরপেক্ষ ভাবে তার উপসংহার করতে পারি। সুদূর প্রাচ্য থেকে এ্যাংলো আমেরিকান শক্তি বিতাড়িত হয়েছে; তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলি এখন প্রশান্ত

মহাসাগরের তলায় কবরে দিয়েছে। ইউরোপ থেকে বৃটিশ শক্তি নির্মূল।
সম্পূর্ণরূপে। এখন দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্রের এই বকুনি নিতান্ত অর্থহীন।
এ্যাংলো আমেরিকান শক্তি কেবলমাত্র যা করতে পারে, তা হোলো অ
ফরাসী সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশে কিছু যুদ্ধ খণ্ড
করা। কিন্তু আফ্রিকা নয়, ইউরোপ এবং এশিয়া, এই দুই মহাদ
ভাগ্য নির্ণয় হবে বর্তমান যুদ্ধের। এবং এশিয়া ও ইউরোপের দিক
এ্যাংলো আমেরিকান শক্তি এবং তার বন্ধুদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকা
যতোটুকু অন্ধকার হওয়া সম্ভব। উত্তর আফ্রিকার অরক্ষিত ফরাসী অ
মার্কিন সৈন্য অবতরণের ব্যাপারটি নিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বেতারে চেঁচা
করেছেন। আমি অবাক হ'য়ে ভাবছি, তাঁরা যদি তাঁদের অপেক্ষাকৃত শক্তি
শত্রুর কাছে কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তবে তাঁরা কী ধরণের প্রচার চালাত
বৃটিশ প্রচার কার্যের ধারা থেকে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৃটেনের
সাধারণের মনোবলে এমন ভাটা পড়েছে যে তাদের আশা উৎসাহ বজায় র
উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উত্তেজকের প্রয়োজন হচ্ছে। কিছুদিনের জন্যে বি বি
জগতের কাছে বলছিল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে
করবে। তারপর আবার সে বলতে সুরু করেছিল যে সোভিয়েট রাশিয়াই এ
এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে। এখন সে বলতে আরম্ভ করেছে, আফ্রি
এই যুদ্ধের স্রোত বদলে দিতে তাকে সাহায্য করবে। একদিন বৃটিশের অ
এক শ্রেষ্ঠ প্রধান মন্ত্রী তাঁর একটি ঐতিহাসিক বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন
ইংল্যাণ্ড তার নিজের চেষ্টায় নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু গত তিন বৎসর
এ ধরণের কোনো উক্তি কোনো বৃটিশকে বারেকের জন্যেও উচ্চারণ ক
শুনলাম না।

"না বন্ধুগণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেদিন আজ আর নেই। সেদিন
কখনো ফিরেও আসবে না। একদিন যা ছিল এক বিশাল শক্তিশালী সাম্রা
আজ তা কেমন ক'রে দ্রুত ধ্বসে পড়ছে, তা আমরা স্বচক্ষেই দেখছি। সাম্রা

ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র যুদ্ধের অবস্থার পর্যালোচনা ক'রে আমি আপনাদের অকপটে বলতে পারি যে, এমন আশান্বিত এর আগে আমি কখনো হই নি। ভারতের জনসাধারণ এবং তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের মধ্যে :আজ আর কোনো অন্তরায় আসতে পারে না। একদিকে চলেছে অবিচার ও অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক পুরাতন বিধি-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার পৃথিবীব্যাপী মিলিত আয়োজন; অপর দিকে চলছে তারই জবাবে সেই পুরাতন বিধি ব্যবস্থাকে ধ্বংস ক'রে এক নূতন বিধি-ব্যবস্থা সৃষ্টির পৃথিবীর মিলিত চেষ্টা।

"এখন ভারতীয় অবস্থার কথা পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমি সর্বপ্রথমেই আপনারা গত কয়েক মাসে যে সাফল্যলাভ করেছেন সেজন্যে পুনরায় আপনাদের অভিনন্দন জানাতে চাই। বৃটিশ প্রচারের ফলে পৃথিবীর সর্বত্র এই ধারণাই সৃষ্টি হয়েছিল যে ট্যাংক, মেসিন গান এবং এরোপ্লেনে সুসজ্জিত শক্তিমান শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের নিরস্ত্র জনসাধারণ স্বল্পক্ষণের জন্যেও টিকতে পারবে না। তাই আপনাদের সাফল্যের সংবাদ একটা আচমকা আনন্দের মতোই আমাদের কাছে এসে পৌঁছলো। ভারতীয় অবস্থার সত্যিকারের স্বরূপকে বাইরের জগতের কাছে গোপন রাখার জন্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অবিরাম চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের এই সমস্ত শয়তানী চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের ঘটনা সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীকে নিয়মিতভাবে সচেতন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি তথাকথিত ইউনাইটেড নেশনসের নিজেদের দলের মধ্যেও ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রচুর সহানুভূতি এবং সমর্থন দেখা যাচ্ছে।

"বন্ধুগণ, আমি ইতিপূর্বেই বলেছি, এই যুদ্ধ হোলো আমাদের সকলের শত্রুর প্রতি সকলের এক মিলিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ভারত এবং অদূর প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলিকে আরো সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। কেবল আপনাদের জন্যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য যাদের গোলাম ক'রে রেখেছে সেই আপনাদের জন্যে—আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন চাই। সুতরাং এই সংগ্রামে যারা

আপনাদের অনেক বেশি। এবং ভারতীয় জনসাধারণের বেশি—সবার চেয়ে। কারণ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিই ভারতবর্ষ। বস্তুত, ভারতবর্ষ বৃটিশের সাম্রাজ্য গড়ে দিয়েছে। সুতরাং এই সাম্রাজ্যকে ধ্বংস ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে মুক্ত করার দায়িত্বও রয়েছে ভারতবর্ষের।

"জাতীয় সংগ্রামের কালে ভারতীয় জনসাধারণ যে সুপ্রচুর নির্যাতন সহ্য করেছেন, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁদের এমন কি আরো বেশি সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হ'তে হবে। স্বাধীনতায় পথ কোনোদিন ফুল দিয়ে তৈরী হয় না। আমাদের দেশের জনসাধারণের জন্যে আরো বহু দুঃখ-যন্ত্রণা ভবিষ্যতের গর্ভে সঞ্চয় রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের আশা করার পূর্বে ভারতের মাটিতে আরো অনেক রক্ত—অনেক নিরপরাধের রক্ত প্রবাহিত হবে। কিন্তু শহীদের রক্তই চিরদিন স্বাধীনতার মূল্য হ'য়ে এসেছে; সুতরাং সে রক্ত-মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত। আমাদের জয় অবধারিত; তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের ছায়া নেই। আমি সেদিন আপনাদের যে ধ্বনির কথা বলেছিলাম, সেই ধ্বনি স্মরণ করুন: 'দুই বৎসর, এবং একলক্ষ জীবন!' দুই বৎসর ধ'রে যুদ্ধ চালাবার জন্যে আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত হ'তে হবে। এবং এই যুদ্ধের সময় আমাদের একলক্ষ জীবন স্বেচ্ছায় বলি দেওয়ার জন্যেও আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমরা যদি এমনি ভাবে সংগ্রাম করতে পারি, তবে আমাদের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী।

"বন্ধুগণ, আমি আমার অংগীকার মতো ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে আমাদের সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে অংশ গ্রহণ করিনি কেন এই কথা ভেবে বি-বি-সি-র অফিসহ আমার বৃটিশ শ্রোতারা হতাশ হ'য়ে পড়েছেন। আমি তাঁদের ধৈর্য ধরার জন্যে পরামর্শ দিতে চাই। এই সংগে তাঁদের আমি একথা-ও জানাতে চাই যে, আমি যে অংগীকার করেছিলাম, তা বৃটিশ সরকারের কাছে নয়, আমার দেশের জনসাধারণের কাছে। সুতরাং তাঁদের নির্ভয়ে থাকতে বলি, যথাসময়ে আমি আমার অংগীকার পালন করবো। রাত্রির পর দিন আসে, এ যেমন সত্য, এই বিশ্বযুদ্ধের পর যে বৃটিশ সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে পড়বে, সে-ও তেমনি

সত্য। এবং এ-ও তেমনি সত্য যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে আমি বেঁচে থাকবো—সেদিন বিদেশে থেকে নয়, দেশে ফিরে গিয়ে, যাঁরা আজ আমার অনুপস্থিতিতে সাহসের সংগে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমি যুদ্ধ করবো।

"ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!"

বৃটেনের ধ্বংস অনিবার্য

[বেৰ্লিন রেডিওতে বেতার বক্তৃতা, ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৩]

"সৌভাগ্যের বিষয় গত এক বৎসরে যে সামরিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তাতে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের সুবিধাই হয়েছে। ইউরোপে এ্যাংলো-আমেরিকান শক্তির বহু ভাবিত 'দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র' খোলার সকল চেষ্টাই হয়েছে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। উত্তর আফ্রিকায় এক্সিস শক্তিই জয়ী হচ্ছে। সুদূর প্রাচ্যে দুঃসাহসী জাপানীরা এ্যাংলো-আমেরিকানদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। দ্রুত ধ্বসে পড়ছে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য। দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এবং ভারতীয় সীমান্তে জাপানীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে পূর্বে এবং পশ্চিমে বৃটিশ ও মার্কিন প্রভাবের পরিপূর্ণ বিলোপ ঘটেছে। যুদ্ধ পৌঁচেছে তার চূড়ান্ত অধ্যায়ে। এক্সিস্ শক্তি দুর্জয় হ'য়ে উঠেছে এবং সময়ও কাজ করছে তাদের স্বপক্ষে।

"গত বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের ওপরই কর্তৃত্ব করেছিল। কিন্তু এবারে ইউরোপ থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে, গত যুদ্ধের প্রধান রংগমঞ্চ ছিল ফ্রান্স। কিন্তু এবারে যুদ্ধের আরম্ভ থেকে বাইরে সরে যেতে হয়েছে তাকে। তখন রাশিয়া ছিল আক্রমণশীল, এখন সে কেবল আত্মরক্ষা করছে। জার্মান বাহিনী সোভিয়েট য়ুনিয়নের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছেছে। গত যুদ্ধের সময় সমুদ্রের ওপর পরিপূর্ণ আধিপত্য ছিল ইংরেজ ও মার্কিণদের। কিন্তু এবারে জলে, স্থলে এবং আকাশে এক্সিসের সমকক্ষ কোনো শক্তি নেই। গত যুদ্ধ কেবল ইউরোপ এবং মধ্য-প্রাচ্যের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু এবারে তার অগ্নিশিখা স্থলে ও আকাশে এক্সিসের আধিপত্যের ফলে সারা

পৃথিবীর ছড়িয়ে পড়েছে। গত যুদ্ধের সময় সুয়েজখাল ছিল বৃটিশের আয়ত্তে। কিন্তু আজকে, বৃটিশের অবস্থা সেখানে শোচনীয়। গত যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি জার্মানীর রসদ বন্ধ ক'রে অবরোধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এবারে ঘটেছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। জার্মানি বৃটেনের রসদ বন্ধ ক'রে অবরোধের সৃষ্টি করেছে।

"এক্সিস শক্তির হাতে রয়েছে অসীম সম্পদ, অপরিমিত জনশক্তি, এবং অগাধ খাদ্যশস্য। অন্যপক্ষে মিত্রশক্তির অবস্থা দিনে দিনে মন্দ থেকে মন্দতর হ'য়ে পড়ছে। জাহাজের অভাব মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রনেতাদের কাছে গুরুতর সমস্যা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই যুদ্ধে জাপানের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যাপারটিই এক্সিস বিজয়কে নিঃসন্দেহ ক'রে তুলেছে। বৃটেন দীর্ঘকাল ধ'রে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে সুরক্ষিত করার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। পূর্ব ভারত রক্ষার ব্যবস্থা সে মাত্র সুরু করেছে ১৯৪১ সালে। গত বিশ বৎসর ধ'রে যে সিংগাপুরকে বৃটেন সযত্নে সুরক্ষিত করেছিল, জাপানীরা মাত্র সাত দিনে তা অধিকার ক'রে ফেলেছে। এই সমস্ত ব্যাপার বিবেচনা ক'রে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি বৃটেনের ধ্বংস অনিবার্য।

''ভারতীয়দের এবার রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে এ্যাংলো-আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জেহাদে অংশ গ্রহণ করা উচিত। তাঁদের এখন উচিত বৃটিশের শাসনের ভারকে দূরে নিক্ষেপ করা। বৃটিশের পরাজয়ের পর ভারতীয়েরা তাঁদের স্বাধীন সরকারের অধিকারী হবেন। ভারতীয়গণ এবং প্রবাসী ভারতীয়গণ! আমি জানি, আমার ওপর আপনাদের বিশ্বাস আছে। এই যুদ্ধের যোগফল অতীব সহজ; বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ এবং ভারতের অনিবার্য স্বাধীনতা। সুতরাং এখন ভারতীয়দের কর্তব্য এক্সিস শক্তির সংগে অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করা এবং তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধে যোগ দেওয়া। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে যারা যোগ দিতে অস্বীকার করে, তারা বিশ্বাসঘাতক। ভারতীয়েরা, যাঁরা বিদেশে আছেন, বর্তমান সংগ্রামে তাঁদের-ও একটি ভূমিকা আছে। বৃটিশের শত নির্যাতন ও উৎপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কবে

এবং কেউই আমাদের নিরুৎসাহ করতে পারবে না। সকল প্রকার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে দৃঢ়সংকল্প হ'তে হবে। ত্যাগ ও কর্মের দ্বারাই আপনাদের দীর্ঘ আকাংখিত লক্ষ্যে গিয়ে আপনারা পৌঁছতে পারবেন, আপনাদের বহুবাঞ্ছিত লক্ষ্যে—স্বাধীনতায়।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস

[বেতার থেকে বেতার বক্তৃতা, ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৩ সাল]

"২৬শে জানুয়ারী। আজকের দিনটিতে পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয়েরা তাঁদের স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্যে সমবেত হন। আজকের দিনটিতে তাঁরা স্বাধীনতায় তাঁদের অটুট দৃঢ় বিশ্বাসের কথা এবং স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অটল প্রতিজ্ঞার কথা পুনরায় ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পতাকার তলে একত্রিত হন। আজকের দিনটিতে ভারতের ঘরে ঘরে ত্রিবর্ণ পতাকা তোলা হয়, সর্বত্র মিছিল বার হয়। সমস্ত দেশময় সভা, ও বিক্ষোভ প্রদর্শন চলতে থাকে। সভাসমিতিগুলিতে 'স্বাধীনতার ইস্তাহার' পাঠ ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতের জনসাধারণ যে সর্বদা তাঁদের এই জাতীয় অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ বিনা বাধায় পান, এমনটি-ও নয়। প্রায়ই তাঁদের পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে বা বৃটিশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর হামলা অগ্রাহ্য ক'রে তাঁদের এই অনুষ্ঠান পালন ক'রতে হয়। এমনি ভাবেই, ঠিক বারো বছর আগে ১৯৩১ সালে যখন ভারতের বৃহত্তম শহর কলিকাতার মেয়র হিসাবে আমি একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা'র পরিচালনা করছিলাম, তখন আমি এবং আমার সংগের অন্যান্য শোভাযাত্রীরা বৃটিশ অশ্বারোহী পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হই। সেদিনের আঘাতের দাগ আমাদের সকলের দেহে আজো অক্ষয় হ'য়ে আছে। চিরদিন থাকবে। কিন্তু যাদের সেদিন সংগীন এবং বন্দুকের গুলীর সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল, তাঁদের চেয়ে আমাদের ভাগ্য ভালোই ছিল।

"দেশে যাঁরা আজ পুলিশের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস, সংগীন আর মেশিন গানকে উপেক্ষা ক'রে স্বাধীনতা দিবস পালন করছেন, যথার্থত তাঁদেরই কাছে

মন কেবলই ছুটে যাচ্ছে। এটলান্টিক সনদ, যার বক্ষে 'বিগ্‌ থ্রী' শান্তি খুঁজে ফিরছে, সেটি এমন চমৎকার বস্তু যে আজ ভারতের সকল জনসভা সমস্ত শোভাযাত্রা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সমগ্র দেশময় চলছে অত্যাচারের এক অবিরাম তাণ্ডব। কারণ কি, না, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এমন স্পর্ধা যে তারা ভারতের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বাধীনতার দাবী করে। ভারতে বৃটিশ শাসন ও শোষণের নৈতিক ন্যায্যতা যে কোনো প্রকারে প্রমাণের উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রচারকরা বলেন যে, ভারতবর্ষ এমন এক ঠাঁই, যেখানে কোনো প্রকার একতা নেই, যেখানে জনসাধারণ চিরকাল নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করছে, যেখানে শৃঙ্খলা এবং প্রগতির সুব্যবস্থার জন্যে বৃটেনের অবশ্য শাসনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এই উদ্ধত বৃটিশাররা নিজেদের সুবিধা মত ভুলে যান যে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা যখন শাসন-ব্যবস্থা ও জাতীয় ঐক্যের কিছুই জানতেন না তার বহু পূর্বে—বস্তুত, রোমানদের বৃটেনে এসে অসভ্য বৃটেন-দের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার বহু পূর্বে—ভারত যে কেবল সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে প্রগতিশীল হ'য়ে উঠেছিল তা নয়, তার চন্দ্রগুপ্ত এক আধুনিক সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছিলেন, দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ থেকে উত্তরে আফগানিস্থান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এক বিপুল সাম্রাজ্য,—যা আজকের ভারতের চেয়েও ছিল বিশালতর। এবং ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানের মানুষ বেবিলনের মতো, মিশরের মতো, গ্রীসের মতো, তার অতীতকে বিস্মৃত হয় নি, যেখানে ইতিহাস ঐতিহ্য মানুষের রক্তে, অস্থিতে, মজ্জায় আজো বেঁচে আছে।

"এই জাতীয় আত্মচেতনার জন্যেই রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, কিছুই আমাদের আত্মাকে হত্যা করতে পারে নি। ভারতে সংগঠিত বৃটিশ শাসন শুরু হয়েছে ১৮৫৮ থেকে—অর্থাৎ ১৮৫৮ সালের মহাবিপ্লবের ব্যর্থতার পর থেকে। এই সময়ের পূর্বে হাজার হাজার বছর ধ'রে ভারত যদি বৃটেনের বিনা সাহায্যেই বেঁচে থাকতে এবং সমৃদ্ধ হ'তে পেরে থাকে, তবে সে আবার যখন স্বাধীন হবে, তখন বৃটেনের বিনা সাহায্যেই বেঁচে থাকতে এবং সমৃদ্ধ হ'তে পারবে।

"১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর, বৃটিশেরা বুঝলো যে তারা কেবল মাত্র শক্তি দিয়ে ভারতকে দীর্ঘকাল অধিকারে রাখতে পারবে না। তাই তারা সমগ্র দেশকে নিরস্ত্র করার ব্যবস্থা করলো। নিরস্ত্রীকরণের সংগে সংগে নব প্রতিষ্ঠিত এবং লণ্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষে 'ভাগ করো এবং শাসন করো' নীতির প্রবর্তন করলেন।' 'ভাগ করো এবং শাসন করো'র এই নীতি ১৮৫৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বৃটিশ শাসনের মূলকথা হ'য়ে রয়েছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল বৃটিশেরা ভারতের তিন চতুর্থাংশ নিজেদের অধীনে রেখে এবং বাকী এক চতুর্থাংশে স্থানীয় রাজা-রাজড়াদের অধীনে ছেড়ে দিয়ে, তারা এই বিভাগের নীতির অনুসরণ করলো। এই সংগে ভারতের বড়ো বড়ো জমিদারের প্রতি-ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রচুর পক্ষপাতিত্ব দেখালেন। যাই হোক, বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বৃটিশরা উপলব্ধি করলো যে তারা কেবল জনসাধারণের বিরুদ্ধে রাজারাজড়া এবং জমিদারদের লেলিয়ে দিয়ে ভারতের উপর স্থায়ী আধিপত্য করতে পারে না। এবার ১৯০৬ সালে,—লর্ড মিণ্টো যখন ভারতের বড়লাট তখন তারা আবিষ্কার করলো মুসলমানদের সমস্যা। এর আগে পর্যন্ত এ ধরণের কোনো সমস্যাই ছিল না ভারতবর্ষে। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবে হিন্দু এবং মুসলমানরা বৃটিশের বিরুদ্ধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে এবং বাহাদুর শাহ্, যাঁর পতাকা তলে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল, তিনিও ছিলেন একজন মুসলমানই।

"গত বিশ্ব যুদ্ধের সময়, যখন বৃটিশরা আবার দেখলো যে, ভারতবর্ষকে আরো রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা না দিলে চলে না, তখন তারা উপলব্ধি করলো, কেবল মুসলমানদিগকে অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করলেই যথেষ্ট হবে না। সুতরাং তারা হিন্দু সম্প্রদায়কেও দ্বিধা বিভক্ত করতে সংকল্প করলো। এইভাবেই ১৯১৮ সালে তারা ভারতে আবিষ্কার করলো জাতির সমস্যা এবং অকস্মাৎ তারা হ'য়ে উঠলো তথাকথিত নির্যাতিত শ্রেণীর মুখপাত্র এবং মুক্তিদাতা। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বৃটেন রাজারাজড়া, মুসলমান এবং তথাকথিত নির্যাতিত শ্রেণীর

মুখপাত্রের ভেক নিয়ে ভারতকে বিভেদগ্রস্ত রাখার আশা করেছিল। কিন্তু ১৯০৫ সালের নূতন গঠনতান্ত্রিক আইন অনুসারে যে সাধারণ নির্বাচন হ'লো, তাতে বৃটিশরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো, তারা দেখলো, তাদের সমস্ত ফন্দী-ফিকির এবং ধাপ্পা ব্যর্থ হয়ে গেছে; এবং জাতীয়তার এক শক্তিশালী মনোভাব সমগ্র দেশকে, তার প্রতিটি অংশকে, প্রতিটি সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সুতরাং বৃটিশের ভেদনীতি এবার তার শেষ অস্ত্রের আশ্রয় নিলো। যদি ভারতের জনসাধারণকে বিভক্ত করা না যায়, তবে এই দেশ ভারতবর্ষকে ভৌগোলিক এবং রাজনীতিক উভয় দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে হবে। এই পরিকল্পনার নাম হোলো পাকিস্থান। এর জন্ম বৃটিশারদের উর্বর মগজে।

"যদিও ভারতের অধিকাংশ মুসলমান এক মুক্ত, স্বাধীন ভারত কামনা করেন, যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মওলানা আবুল কালাম আজাদও একজন মুসলমান, যদিও কেবলমাত্র সামান্য-সংখ্যক ভারতীয় মুসলমান মাত্র পাকিস্থান পরিকল্পনার সমর্থন করেন, তথাপি বৃটিশ প্রচারযন্ত্র সমস্ত পৃথিবীময় এই ধারণার সৃষ্টি করছে যে ভারতীয় মুসলমানেরা এই জাতীয় সংগ্রামের পশ্চাতে নেই এবং তাঁরা ভারতবর্ষকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে নিতেই চান। বৃটিশেরা নিজেরা-ও বেশ জানে তারা যা প্রচার করছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু তবু তারা আশা করে, বারে বারে একই মিথ্যার পুনরাবৃত্তি ক'রে তারা পৃথিবীকে এ সম্বন্ধে বিশ্বাস করাতে সমর্থ হবেই।

ভারতে বৃটেনের বৃটিশ নীতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমি আপনাদের অনেকখানি সময় নিয়েছি। কারণ, আমি আপনাদের বলতে চাই যে যদিও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের এক ধূর্ত ও শয়তান শত্রু, তবুও ভবিষ্যতে তার কাছে প্রতারিত হবার আমাদের কোনো সম্ভাবনা নেই। বৃটেন ও ভারতের মধ্যে আপোষ মীমাংসা অসম্ভব। কারণ ভারত ও বৃটেনের পরস্পরের স্বার্থ এক নয়; তাদের জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্সিস্ শক্তি

আজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে লড়ছে। এবং ভারতও তার চিরশত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে যুদ্ধরত।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদ কখনো এক সংগে বেঁচে থাকতে পারে না। একের বেঁচে থাকার জন্যে অপরের ধ্বংস অনিবার্য। এবং ভারতের জাতীয়তাবাদ বেঁচে থাকবে, সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস চাই-ই। বাস্তবিক পক্ষে আজকে ভারতে যে সংগ্রাম চলছে তা ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের ক্রমাবির্ভাব মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চল্লিশ বৎসরে এই ভারতীয় আন্দোলন সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতায়কে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হোলো, তখনই এই আন্দোলন একটি মাত্র সংগঠনে দানা বেঁধে উঠলো। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে এক নব জাগরণ দেখা গেলো। এবং এই নব জাগরণের সংগে সংগে সংগ্রামের এক নূতন রীতির ঘটলো আবিষ্কার। এইভাবে দুই দশকের মধ্যে আমরা একদিকে দেখলাম বৃটিশ মালের অর্থনৈতিক বর্জন, এবং অন্যদিকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ। গত যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা মরিয়া হ'য়ে উঠলেন, তাঁরা সমস্ত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই চাইলেন বৃটিশ শাসনের ধ্বংস। এই সময় আমাদের পরম শত্রু বৃটেনের সংগে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া হাংগেরি এবং তুরস্ক। কিন্তু তাঁরা, এই ভারতীয় বিপ্লবীরা, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বৃটিশের হাতে নিষ্পেষিত হলেন।

যুদ্ধের পর সংগ্রামের জন্যে এক নূতনতর অস্ত্রের প্রয়োজন হোলো ভারতের। ঠিক এই চরম মুহূর্তটিতে মহাত্মা গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রীতি নিয়ে এলেন এগিয়ে। গত ২২ বৎসর ধ'রে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সামন্ত রাজ্যগুলি সহ সমগ্র ভারতেই এক বিপুল শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তুলেছে। দূর দূরান্তের পল্লীতেও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা-বোধ জাগিয়ে তুলেছে এই কংগ্রেস। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হোলো এই যে নিরস্ত্র হ'য়েও কেমন ক'রে সবল শত্রুকে আঘাত করা যায় ভারতের জনসাধারণ তা

শিখে ফেলেছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রমাণ ক'রে দেখিয়েছে, কেবল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অস্ত্রের দ্বারাই একটা শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে পংগু ক'রে দেওয়া যায়। এই সংগে ভারতের তরুণতর-রা-ও বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই জ্ঞান লাভ করেছে যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ফলে একটা শাসনযন্ত্রকে অচল ক'রে দেওয়া যায় সত্য, কিন্তু দৈহিক বলপ্রয়োগ ভিন্ন কেবল এর দ্বারাই একটা শাসনযন্ত্রকে বিচ্যুত বা বিতাড়িত করা অসম্ভব। এই অভিজ্ঞতার ফলেই আজকে দেশের জনসাধারণ স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে সক্রিয় সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলেছে। তাই আজকে আপনারা পড়ছেন কিম্বা শুনছেন যে ভারতের নিরস্ত্র জনসাধারণ রেলপথ নষ্ট করছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে টেলিগ্রাফের টেলিফোনের তার কাটছে; থানায়, পোষ্টাফিসে, সরকারী ঘর বাড়িতে আগুন দিচ্ছে; তারা বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে আরো বহু প্রকারে বলের প্রয়োগ করছে।

১৯২৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত সমস্ত অভিযানেই আমি অংশ গ্রহণ করেছি। এই সময়ের মধ্যে আমি এগারো বার বৃটিশের তত্ত্বাবধানে ছিলাম এবং এর অধিকাংশ বারেই কোনো আইন-আদালতের বিনা বিচারেই। আমার এই অভিজ্ঞতা থেকে, এবং ভারতের বর্তমান সংগ্রামের যে সংবাদ পাচ্ছি তা থেকে আমি বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত না ক'রেই বলতে পারি, এবারে এই আন্দোলনকে দমন করা বৃটিশের পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য আমার এই আশাবাদিতার জন্যে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক কারণও রয়েছে বহু। আভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে আমি বলতে পারি যে, এই সংগ্রাম সমস্ত ভারতময় বিস্তৃত হ'য়ে পড়ছে এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণও এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছেন। কেবল তাই নয়, এই আন্দোলন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিণতি লাভ করেছে সক্রিয় সংঘর্ষের মধ্যে। বাহ্যিক কারণগুলির মধ্যে আমি বলতে পারি যে এবারে ভারত কেবল একাই যুদ্ধ করছে না। অক্ষশক্তি এবং তার বন্ধুরাও আমাদের এই যুদ্ধে আমাদের মিত্রে পরিণত হয়েছে। কারণ

আমাদের দুজনের শত্রু আজ এক। এমন কি ভারতের জনসাধারণও নিশ্চিত উপলব্ধি করেছে যে ভারত এখন তার স্বাধীনতা অর্জনের যে গৌরবময় সুযোগ লাভ করেছে, বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাসে তার তুলনা অতি বিরল। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা হোলো এই যে বৃটিশের পরাজয়ের এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের আগে এ যুদ্ধের শেষ হবে না। এমনি একটি দৃঢ় বিশ্বাসও সমস্ত ভারতময় আজ ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষে আমরা সর্বদা দুঃখ প্রকাশ করি যে, গত যুদ্ধের সময় দেশের তদানীন্তন নেতারা যুদ্ধের পরিস্থিতিকে আমাদের উপকারে লাগাতে পারেন নি। তাই এবারে আমার পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ভারত ছাড়ার, এবং ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধকে আমাদের পুরাতন শত্রু বৃটেনের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তির সংগ্রামের সংগে যুক্ত ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। যদিও ভারতের জনসাধারণকে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে প্রধানত নিজেদেরই ওপর নির্ভর করতে হবে, তবু বৃটেনকে দুর্বল ক'রে দেয় এমন যে-কোনো ব্যাপারই স্বতই তাদের সহায়ক হ'য়ে ওঠে। তাই যে সাহায্য আজ ইতিহাস এবং ভারতের সৌভাগ্য ভারতকে দিয়েছে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার না করা বাস্তবিক পক্ষে ভারতের জনসাধারণের মূঢ়তাই হবে।

বিদেশে আমার কার্য-কলাপ সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, ভারতের বাইরে এসে আমি যা করেছি, তা আমার স্বদেশবাসিদের অধিকাংশেরই পূর্ণ সমর্থন লাভ করবে। বস্তুত, ভারতের মুক্তির জন্যে আজকে দেশে যে সকল ভারতীয় যুদ্ধ করছেন এবং ভারতের বাইরে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্যই রয়েছে। অবশ্য, এরকমের কোনো ধারণার আমি সৃষ্টি করতে চাই না যে, দেশে তাঁরা এ পর্যন্ত যা করেছেন, তাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হ'তে পেরেছি। আমরা কেবল এইটুকু সন্তোষ লাভ করেছি যে, বর্তমানে ভারতের আন্দোলন গতিশীল হ'য়ে উঠেছে এবং তা সক্রিয় প্রতিরোধে পরিণত হয়েছে

এবং তা এমন শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছে যে এ্যাংলো আমেরিকার কথার বাহিনীও আর তাকে দমন করতে পারবে না।

অভিযানের বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য রয়েছে দুটি—ভারতে শাসন ব্যবস্থার প্রতিরোধ করা, এবং ভারতে বৃটেনের সামরিক উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংস করা। কিন্তু আগেই হোক কিম্বা পরেই হোক, একদিন এই সংগ্রামের চরম অধ্যায়ে আমাদের পৌঁছতেই হবে। এই চরম অধ্যায়টি হোলো সশস্ত্র বিপ্লবের ফলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে, বর্তমান বৎসরেই ১৯৪৩ সালে, যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এবং আমাদের সকলের সংযুক্ত জয়লাভের জন্যে ভারতীয়দের চরম চেষ্টাও করতে হবে এই বৎসরেই। মিত্র শক্তিরাও সম্ভবত এই বৎসরের পূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করেছে। এবং সেই জন্যেই বোধ করি তারা নববর্ষের তারিখ থেকে প্রচারকার্যও চালাচ্ছে ভয়াবহভাবে। লণ্ডন বা নিউইয়র্ক থেকে প্রচারকেরা কি বলেন, তা যদি কেউ শোনে বা পড়ে, তবে তার মনে হবে, এ্যাংলো-আমেরিকানরা বুঝি ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। এক্সিস্ শক্তি নৃশংস অত্যাচার ও ভয়াবহ নির্যাতন করছে ব'লে অভিযোগ ক'রেও তারা রোমহর্ষক সব কাহিনীর প্রচার চালাচ্ছে। গত যুদ্ধের সময় জার্মানির বিরুদ্ধেও তারা এমনিটি করেছিল। কিন্তু তাদের এই প্রচার কাহিনীগুলি এতোই স্পষ্ট যে, সেগুলি দ্বিতীয়বার কোনো মানুষকে প্রতারিত করতে পারবে না। নিজেদের মনোবল টিকিয়ে রাখার জন্যে এ্যাংলো-আমেরিকানরা যে এই ধরণের প্রচারকার্যের আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'য়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় তাদের প্রকৃত অবস্থাটা কি।

যিনিই এই সমগ্র যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে বিচার ক'রে দেখবেন, তিনিই কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হবেন। সে সিদ্ধান্ত হোলো এই যে, এক্সিস্ শক্তির জয়লাভের সংগেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আমরা ভারতের জনসাধারণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাদের বাঁচবার

অধিকার আছে, কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের জন্যে নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যে। কারণ সমস্ত মানব জাতির এক পঞ্চমাংশ হলাম আমরা, ভারতবাসীরা। স্বাধীন ভারত পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বহুল পরিমাণে বহু সম্পদ দান করতে পারবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমাপ্তি ঘটাবে এই স্বাধীন ভারত—যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মানবজাতির একটি বিপুল অংশের দাসত্বের, দারিদ্র্যের এবং শোষণের জন্যে ছিল দায়ী। স্বাধীন ভারতের অর্থ হবে, ভারতের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় অতীতে ইউরোপ এবং অন্যত্রে যে সকল যুদ্ধ ঘটেছে সেগুলির শেষ। স্বাধীন ভারতের অর্থ হবে এই যে, অদূর, সুদূর ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি ফেলতে পারবে মুক্তির নিঃশ্বাস। কারণ, তখন তাদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যস্ত সন্ত্রস্ত করার মতন কোনো শক্তিই আর থাকবে না। এবং অবশেষে, আর এই ব্যাপারটি মোটেই সামান্য নয়, পৃথিবীর বর্তমান অর্থনীতিক ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যে ভারতবর্ষই সর্বপ্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ড ছাড়া আর সমগ্র পৃথিবীর কাছেই স্বাধীন ভারত হ'য়ে উঠবে দেবতার আশীর্বাদ। ভারতের সংগে যাঁরা সাংস্কৃতিক এবং অর্থনীতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চান, তাঁদের কাছেও এ হবে সুবর্ণ সুযোগ। ৩৮ কোটি মানুষের বাসস্থান এই ভারতবর্ষ যখন প্রথমে শিল্পে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে, তার বিপুল সুদূরপ্রসারী তরংগাঘাত এসে লাগবে সারা আধুনিক শ্রমশিল্পী পৃথিবীতে। আমরা, আজ যারা ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ব্যাপৃত আছি, স্বাধীন ভারতে আমরা কি করবো, তা আমাদের বেশ ভালো ক'রেই জানা আছে। আমরা তাই নূতন ভারত গ'ড়ে তোলার জন্যে এক জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তুত করছি। স্বাধীন ভারতে পুনর্গঠনের কাজ কেবল যে ভারতের জনসাধারণকে স্বার্থান্বিত ক'রে তুলবে, তাই নয়, তা স্বার্থান্বিত ক'রে তুলবে সমগ্র সভ্য পৃথিবীকে।

অবশেষে আমি স্বদেশের মাঝে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সেই সমাগত বহু-

নারীদের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন। আমাদের দিক থেকে আমি তাঁদের সুনিশ্চিত ভরসা দিতে পারি যে যতোদিন আমাদের শত্রু বিধ্বস্ত না হয়, যতো দিন আমরা জয়লাভ না করি, ততোদিন পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। এই সংগ্রামে, যা ভারতের কাছে জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম হয়ে উঠেছে—যা ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হয়ে উঠেছে—এতে একটি মাত্র লক্ষ্য আমাদের থাকবে; সে লক্ষ্য আমাদের জয়লাভ, আমাদের স্বাধীনতা।"

স্বাধীনতা আসন্ন

[বার্লিন থেকে বেতার বক্তৃতা, ১লা মার্চ, ১৯৪৩ সাল]

"বন্ধুগণ, আমি যখন বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে ভারত ত্যাগ করলাম, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। প্রথম, নিজের জন্যে পৃথিবীতে কী ঘটছে, তার সত্য আবিষ্কার করা; দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতকে কোনো মিত্র সংগ্রহ ক'রে দেওয়া। দেশ ত্যাগ ক'রে বাইরে থাকার সময় আমি স্বচক্ষে সব কিছু দেখেছি, স্বকর্ণে সব কিছু শুনেছি। এই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে দুই দল কি ভাবে প্রচারের যুদ্ধ চালাচ্ছে, তা-ও আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছি। ফলে, বাস্তবিকপক্ষে বর্তমানে কী ঘটছে, এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ একটা মতামত গঠন করতে আমি সমর্থ হয়েছি। এবং এই দীর্ঘকাল ধ'রে বহু পরিশ্রমের সংগে বিশ্ব রাজনীতির সতর্ক পর্যালোচনা করার পর আমার বিচারে ভুল হবার সামান্যতম সম্ভাবনা-ও নেই। এই সংগে আমি একথা-ও বলতে চাই যে, দেশ ত্যাগ করার পরে আমি যা করবো, তা কেবল মাত্র ভারতের জন্ত মুক্তির জন্যেই করা হয়েছে, এবং করা হবে। এবং ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন লাভ করবে না, এমন কিছুই আমি করবো না। তাছাড়া একথাও আমি বলতে পারি যে ধূর্ত বিবেকবুদ্ধিহীন শক্তিশালী বৃটিশ সরকার যখন আমাকে প্ররোচিত করতে সমর্থ হয়নি, তখন পৃথিবীর আর কোন শক্তিই তা করতে সমর্থ হবে না। আমার যাই ঘটুক না কেন, আমার একমাত্র কর্তব্য আছে ভারতের কাছে, এবং কেবল মাত্র ভারতের কাছে-ই।

ইউরোপে আসার পর থেকে ক্রমে আমি বহু জিনিস লক্ষ্য করেছি এবং

তাই আমি প্রতিদিন বি, বি, সি, থেকে যে-মিথ্যা প্রচার চালানো হয়, তার সংগে বাস্তবিক ঘটনার তুলনা ক'রে দেখার সুযোগ পেয়েছি। লণ্ডনের বি, বি, সি, হোলো 'বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন' নয়—'ব্লাফ্‌ অ্যাণ্ড ব্লাস্টার কর্পোরেশন।' বৃটিশ যে যুদ্ধে পরাজিত হ'তে যাচ্ছে, এবং তার এই চরম পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য যে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে আপনারা আমার একথা বিশ্বাস করুন। আমরা সক্রিয়ভাবে বৃটেনের সাহায্যই করি, কিম্বা চুপ-চোরাভাবে নিরপেক্ষই থাকি, এই ভয়াবহ সংগ্রামের হাত থেকে তিলমাত্র অব্যাহতি পাবার বৃটেনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় একটি গতিশীল ভূমিকায় অবতরণ করা ভারতের পক্ষে কেবল বিচক্ষণতা বা বুদ্ধিমত্তা নয়, অনিবার্য প্রয়োজন-ও। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙনের ব্যাপারে ভারতের স্বকীয় প্রচেষ্টা ও ত্যাগের দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে এমন কিছু সাহায্য করা উচিত, যার ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভস্মের মধ্য থেকে বিজয়-গৌরবান্বিত এক ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে—যে ভারত হবে ভারতীয় জনসাধারণেরই আপন হাতের সৃষ্টি।

বন্ধুগণ, এই সংকটকালে নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ থাকার অর্থ হবে রাজনৈতিক আত্মহত্যা। যদি আমরা তা করি, তবে বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়া সত্ত্বে-ও হয় আমাদের দাসত্বই স্থায়ী হ'য়ে থাকবে, নয়, স্বাধীনতাকে আমাদের নিতে হবে এক্সিস্‌ শক্তির দান হিসাবে। আমরা দুটির কোনোটিই চাই না। সুতরাং ভারতের জনসাধারণকে স্বাধীনতার যুদ্ধ করতে হবে, এবং স্বাধীনতা জয় ক'রে নিতে হবে। কিন্তু এই যুদ্ধে বিদেশ থেকে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন আছে। গত ২০০ বছরে সমস্ত পৃথিবীতে যতো স্বাধীনতার সংগ্রাম গেছে, সেগুলির সমস্তই আমি অতি সাবধানতার সংগে পাঠ ও আলোচনা করেছি। এবং এখনো পর্যন্ত এমন কোনো উদাহরণ পাই নি, যেখানে বাইরের কোনো প্রকার সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হ'য়েছে। আর যেখানে এক শক্তি-শালী বিশ্ব-সাম্রাজ্য, সেখানে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন তো আরো বেশি। এবং যেখানে এই বিশ্ব-সাম্রাজ্য, অর্থাৎ বৃটেন, আবার অপর কয়েকটি

শক্তির সাহায্যে সুরক্ষিত, সেখানে বাইরের কারো প্রকৃত সাহায্য না নেওয়াই হবে চরমতম মূর্খতা। বৃটেন যখন আমেরিকা, চীন, আফ্রিকা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য জায়গা থেকে সামরিক দ্রব্য ও সৈন্য অজস্র পরিমাণে ভারতে আমদানি করছে, তখন আমরা যদি অন্য কারো কাছ থেকে সাহায্য নিই, তাতে বৃটিশারদের বলার কিছুই থাকে না। অবশ্য, ভারতবর্ষকে এ কথা ভেবে স্থির করতে হবে যে কি সাহায্যের তার প্রয়োজন, এবং সাহায্যের প্রয়োজন যতোই কম হয়, ততোই তার পক্ষে ভালো। আমাদের যারা বন্ধু এবং সহায়ক, কেবল মাত্র তাদের কাছে-ই আমরা সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারি। বর্তমান ক্ষেত্রে যারাই বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের চেষ্টা করছে, তারাই সাহায্য করছে আমাদের মুক্তির জন্যে। সুতরাং তারাই আমাদের বন্ধু, তারাই আমাদের সহায়ক! অন্যপক্ষে যারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে, তারাই চেষ্টা করছে আমাদের এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার। এই তথ্যের কথা বাদ দিলেও, হের হিটলার এবং সিনিয়র মুসোলিনির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই সংগ্রামে এক্সিস্ শক্তিই ভারতের বাইরে আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সেরা সহায়।

"বন্ধুগণ, আমি জানি যে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মতো আমার কতিপয় বন্ধু এক্সিস্ শক্তির আন্তরিকতায় বিশ্বাস করতে হয়তো ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, নিজেদের স্বার্থের জন্যেই এক্সিস্ শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে দৃঢ় সংকল্প, এবং এ ধ্বংস তারা করবেই। এবং বৃটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের নিষ্কৃতি পাবার ব্যাপারে বৃটিশ শক্তির ধ্বংস ভারতকে নিশ্চিত প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করবে। কেবল তাই নয়, ভারত যদি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে, তবে ত্রিদল শক্তিসহ সমগ্র পৃথিবীরই লাভ হবে। ভারতের মুক্তি দুঃখের কারণ হবে কেবল মাত্র বৃটিশের। ভারতীয় ইতিহাসের এই পরম মুহূর্তে আদর্শ বা নীতির কারণে বিচলিত হওয়া

আমাদের পক্ষে মর্মান্তিক ত্রুটি হবে। জার্মানি, ইটালি ও জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি আমাদের ভাববার বিষয় নয়। সে কথা ভাববে সেই সব দেশের জনসাধারণ। তবে একথা শিশুরাও বোঝে যে ত্রিদল শক্তির আভ্যন্তরিক রাজনীতির অর্থ যাই হোক না কেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য যে ভারতের একমাত্র শত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ, তা নিঃসন্দেহ। আমরা কী স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না যে সমস্ত মতবাদের কথা বাদ দিয়েও ইংল্যাণ্ড আজ সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে সহযোগিতা করছে? দেশে আমার যে সমস্ত বন্ধু ও সহকর্মী আছেন, তাঁদের স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরিক এবং বৈদেশিক নীতির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত করতে শেখার এখন উপযুক্ত সময় এসেছে। স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরিক নীতি স্থির করবেন ভারতের জনসাধারণ নিজেরা। এবং তাঁদেরই নির্ধারিত করতে হবে বৃটেনের শত্রুদের সংগে সহযোগিতার কথা। বৈদেশিক ব্যাপারে আমি যখন এক্সিস্ শক্তির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার দাবী করি, তখন ভারতের জাতীয় ব্যাপারে আমি ভারতের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যেরই পরিপূর্ণরূপে পক্ষপাতী। স্বাধীন ভারতের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কারো কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ-ই আমি কোনো দিন সহ্য করবো না। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনীতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে, আমি দেশে থাকাকালে আমার যে সকল মতামত ছিল, তা আজো ঠিক তেমনিই আছে।

সুতরাং ত্রিদল শক্তির বাহ্যিক সহযোগিতার অর্থ তাদের আধিপত্য এবং এমন কি আভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্পর্কে তাদের মতবাদগুলিকে-ও মেনে নেওয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত ক'রে কেউ যেন ভুল ক'রে না বসেন।

'বন্ধুগণ, আজকে আমার কর্তব্য হোলো ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামকে পরিচালিত করা। যেদিন এই দায়িত্ব পালিত হবে এবং ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করবে, সেদিন আমার প্রথম কর্তব্য হবে জনসাধারণ কী ধরণের গভর্ণমেন্ট চান, তা নির্ধারিত করবার ক্ষমতা তাঁদেরই হাতে ছেড়ে দেওয়া। এবং ১৯৪০ সালের পূর্বভাগে জেলে যাওয়ার পূর্বে আমার বিদায়ী আলোচনায় আমি মহাত্মা গান্ধীকে

যেমনটি বলেছিলাম, ঠিক তেমনি ভাবেই আমি যখন ভারতবর্ষকে বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার আদর্শে সাফল্য লাভ করবো, আবার সেদিন আমি তাঁকে আমার আহ্বান জানাবো। আমাদের সকলের অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের কথা যে আজ সুদূর প্রাচ্যে আমাদের স্বদেশবাসীরা ত্রিদল শক্তির কূটনৈতিক সমর্থন ও সাহায্য লাভ ক'রে মাতৃভূমির দ্রুত,মুক্তির উপায় ও পন্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যে ব্যাংককে এক সম্মেলনে সমবেত হ'চ্ছেন। আমি বহুবার বলেছি, ভারত থেকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের চ'লে যাওয়ার পর থেকেই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের শেষ অধ্যায় শুরু হয়েছে। শীঘ্রই আমরা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছবো, যখন এ্যাংলো মার্কিন সৈন্যরা যদি স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ না করে, তবে আমাদের অস্ত্র ধারণের প্রয়োজন ঘটবে। বন্ধুগণ, আপনারা সেই শুভ দিনের জন্যে প্রস্তুত হোন এবং সেই সংগে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে এবং ভারত ছেড়ে পালাবার আগে বৃটিশরা যাতে এই পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ ক'রে এই দেশকে যথেচ্ছ ভাবে ধ্বংস ক'রে না দেয় তার জন্যে নিজেদের সংগঠিত করুন।

"বৃটিশ সাম্রাজ্য আজকে এমন ভগ্নপ্রায় জীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নির্ভুল নেতৃত্ব এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে ভারতের জনসাধারণের মুক্তি লাভ সম্ভব। এই মুক্তি আসতে আর বিলম্ব নেই। বর্তমান যুদ্ধের মধ্যেই ভারত তার স্বাধীনতা লাভ করবে। এবং আমি আবার বলছি, যখন সময় আসবে তখন আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে শেষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত থাকবো। যে শক্তি আমার ভারতের বাইরে চ'লে আসা বন্ধ করতে পারে নি, সে-শক্তি আমার ভারতে প্রবেশও প্রতিরোধ করতে পারবে না। এখন বন্ধুগণ, আমাদের যেসব সহকর্মী এখন কারাগারে আছেন, তাঁদের কাছে আপনারা উৎসাহের বাণী পাঠান। তাঁদের বলুন, তাঁরা যেন ধৈর্যের সংগে সময়ের প্রতীক্ষা করেন, যখন আমরা তাঁদের অস্ত্র এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম এনে দেবো, এবং তাঁরা ভারতের শেষ স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক হ'য়ে উঠতে পারবেন।

"আমার স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ! আর কিছু বলার আগে, আমি আমার এবং আমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে, আবার আপনাদের একবার অভিনন্দন জানাই। আমরা সর্বপ্রথমে আপনাদের জানাতে চাই, ভারতের স্বাধীনতার এই দুঃসাহসিক যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত ক'রে দিয়েছে। বস্তুত, ভারতে বৃটিশের আতংক এবং নৃশংস অত্যাচারের কথা লোকে আদৌ অবিশ্বাস করতে চায় নি। ফলে আমাদের দেশে নিরস্ত্র নর নারীর ওপর যে ব্যাপক গুলী চালানো হ'য়েছে, তার সাফাই করার জন্যে ইংল্যাণ্ডের নেতৃস্থানীয়দের বক্তৃতা করতে বাধ্য হ'তে হয়েছে। এই সকল বক্তৃতার ফলে-ও আবার বাইরের জগতের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে ভারতে বিদ্রোহ বেধেছে, এবং ভারত থেকে বাইরে যে সমস্ত সংবাদ আসছে, সেগুলি সম্পূর্ণ সত্য, বিন্দু মাত্র অতিরঞ্জিত নয়। বন্ধুগণ, আমি এখন আপনাদের নিশ্চিত ক'রে জানাতে চাই যে ভারতের অভ্যন্তরে যা ঘটেছে, তার সংবাদ এখন নিয়মিতভাবে পৃথিবীর সকল অংশেই গিয়ে পৌছে। বৃটিশ আর কোনোমতেই ভারতকে অবশিষ্ট পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে না। আমি লক্ষ্য করেছি, এক একটি দিন যাচ্ছে, আর অতীব অপ্রত্যাশিত মহল থেকেও ভারতের জনসাধারণের জন্যে ক্রমাগতই অধিক পরিমাণে সহানুভূতি এসে পৌছচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীর সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আজ ভারতের স্থান। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছ থেকে ভারত আজ কেবলমাত্র সহানুভূতিই প্রত্যাশা করতে পারে না, সে প্রত্যাশা করতে পারে তার স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্যে যে কোনো সাহায্য তার প্রয়োজন। বাইরে থেকে ভারতের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, এবং যদি থাকে, তা কি পরিমাণে আছে, ভারতের জনসাধারণই তা স্থির করবেন। বন্ধুগণ, এই সঙ্গে আমি আপনাদের আরো জানাতে চাই যে, ইউরোপে, আমেরিকায় এবং সুদূর প্রাচ্যে আপনাদের যে-সব স্বদেশবাসী আছেন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করছেন যে বৃটিশ শাসনের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার ভারতের একটি স্বর্ণ সুযোগ এসেছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জার্মানির ভারতীয়েরা

বর্তমানে ভারতে যে সংগ্রাম চলছে, তার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁরা এই সংগ্রামের সমর্থন ও সাহায্যের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ এই যে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইতিমধ্যে জাতীয় সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্তও ক'রে ফেলেছেন।

ভারত সম্পর্কে বলা যায় যে শীঘ্রই ঘটনার মোড় ফিরবে। এবং যখনই সেই চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে এবং সংগ্রামের চরম অধ্যায় শুরু হবে, তখনই ভারতকে তার শেষ আঘাত হানতে হবে। সেই শেষ আঘাত, ভারত যা হানবে, তা-ই হবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর আঘাত। সুতরাং তখন এই শয়তানী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের গৌরবটুকু ভারতেরই প্রাপ্য হবে। বন্ধুগণ, আমি বিদেশে থাকার ফলে যা দেখেছি এবং যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তা থেকে আমার একটি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, যা এর আগে কোনোদিন জন্মে নি। সে দৃঢ় বিশ্বাস হোলো এই যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙে ধ্বসে পড়বে, এবং তার ধ্বংসস্তূপ থেকে জেগে উঠবে এক স্বাধীন ভারত। তাই আমি আজ আমার স্বদেশবাসীদের সকল আতংক, সকল সন্দেহ, সকল দ্বিধা ত্যাগ ক'রে এগিয়ে আসতে আহ্বান করছি। তাঁরা আসুন, তাঁরা তাঁদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে সাহায্য করুন এই জাতীয় সংগ্রামকে। যারা বৃটিশ সরকারের পক্ষে যুদ্ধ করছে, তাদের সংকটকাল আসন্ন। আজ এ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে, বৃটেন এবং তার সহায়কদের বিরুদ্ধে এখন সময় কাজ ক'রে চলেছে। সময় এখন কাজ করছে ভারতের স্বপক্ষে। সুতরাং এখন আমাদের সর্বথা, সময়ের বিনিময়েই যুদ্ধ ক'রে যেতে হবে। অন্ততঃ পক্ষে দুই বৎসর কাল যুদ্ধ চালাতে হবে এবং এই যুদ্ধের কালে অন্ততপক্ষে এক লক্ষ মানুষ বলি দিতে আমাদের দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। এই দুই বৎসর শেষ হবার বহু আগেই নিশ্চয় ভারত তার স্বাধীনতা লাভ করবে। সুতরাং আমাদের ধ্বনি হবে 'দেশের স্বাধীনতার জন্যে দুই বৎসর লড়বো, এবং একলক্ষ জীবন আহুতি দেবো।' আপনারা যদি তা পারেন, আমি যদি তা পারি, তবে আপনাদের স্বাধীনতা সাফল্য নিঃসন্দেহে।

আমি আবার একবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা এখন যে অহিংস গেরিলা-যুদ্ধ চালাচ্ছেন, তার লক্ষ্য হবে দুটি : প্রথমত, ভারতের অসামরিক শাসন-ব্যবস্থাকে অচল ক'রে দেওয়া ; দ্বিতীয়ত, ভারতে যুদ্ধ-উৎপাদন ধ্বংস করা। এই সংগে একথাও আমি আপনাদের বলতে চাই যে ভারতীয় সৈন্ত বাহিনীর মধ্যে আমাদের প্রচারকে তীব্রতর ক'রে তোলার উপযুক্ত সময় এসেছে। ভারতীয় সৈন্ত বিভাগে আমাদের দলের লোক সাধ্যমত অধিক সংখ্যায় পাঠালেই তা সম্ভব হ'তে পারে। জাতীয় সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে ভারতীয় বাহিনীকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

"বন্ধুগণ, আপনারা হয়তো এতোক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, স্বাধীনতার যুদ্ধে ভবিষ্যতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে হ'বে বাংলাকে। এই আকস্মিক বিপদ্‌কালের জন্তে আমার বাঙালী ভাইবোনদের আমি প্রস্তুত হ'তে বলি। আবার আমি আমার সিংহলী ভাইবোনদের-ও আহ্বান করছি, তাঁরা এগিয়ে আসুন, তাঁরা আমাদের সকলের এই স্বাধীনতার জন্তে আমাদের সংগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলুন। এ কেবল ভারতেরই সুবর্ণ সুযোগ নয়, সিংহলেরও। ভারত যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে বিপুল বিক্রমের সংগে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তখন সিংহলের কর্তব্য অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হ'য়ে এসেছে, যতো সহজ অন্তথায় হোতো না। ভারতেরও যেমন, সিংহলেরও তেমনি, এই অভিযানের মূলমন্ত্র হবে : 'হয় এখন, নয় কখনো নয়।' সিংহল কেবল ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধ ক'রেই স্বাধীন হবার আশা পোষণ ক'রতে পারে।

বন্ধুগণ, এ্যাংলো-আমেরিকান প্রচারকদের প্রচারে ও প্রতারণায় মুহূর্তের জন্তেও বিচলিত হবেন না। নিজেরাই একবার পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আজকের অবস্থাটা বুঝতে পারবেন। কেবলমাত্র আফ্রিকা ছাড়া, মিত্রশক্তিরা পৃথিবীর কোথাও নাম করার মতো কোনো সাফল্যই লাভ করে নি। এমন কি আফ্রিকাতেও, মিত্রশক্তিরা দুনিয়ার কাছে যা অংগীকার

করেছিল, তাও করতে পারে নি। উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল আইসেনহাওয়ার এখনো পর্যন্ত এক জায়গায় বসে বসে তাল ঠুকছেন, কখনো বা পিছু হটছেন। পরাজয়ের এই কলংক ঢাকার জন্যে তাঁরা বলছেন, যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হোলো রাশিয়া, আফ্রিকা নয়। ইউরোপে বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য বা প্রভাব কিছুই নেই। আর রাশিয়ার বাস্তবিক অবস্থা কি তা দুইটি সৈন্য বাহিনীর অবস্থান-স্থল লক্ষ্য করলেই যে কোনো লোক সহজেই বুঝতে পারে। সুদূর প্রাচ্যে অ্যাংলো-আমেরিকানরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে, এবং জাপানী সৈন্যরা এখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। জাপানী প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজো বারবার ঘোষণা ক'রে সমগ্র পৃথিবী এবং ভারতবাসীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, এশিয়াতে তাঁদের নীতি কি, এবং বস্তুত ভারতের প্রতি তাঁদের নীতিই বা কি। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা ঘটবে আফ্রিকায় নয়, ইউরোপে এবং এশিয়ায়। সেখানে বৃটেন ও আমেরিকার অবস্থা সংগীন; তাদের সমস্ত প্রচারের চেঁচামেচি যতোই বেশি হোক না কেন, তা তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

বন্ধুগণ, অবশেষে আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমাদের ইতিহাসের এই পরম ক্ষণে, আপনারা সকলেই প্রাণপণে আপনাদের শক্তি নিয়োগ করুন। জয় সুনিশ্চিত। কাল আমাদের পশ্চাতে। বিদেশে আমাদের বন্ধুরাও আমাদের সাহায্য করার জন্যে পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুত। এর চেয়ে বেশি আমরা কি আশা করতে পারি? যাই ঘটুক না কেন, যাই ক্ষতি হোক না কেন, আমাদের কেবল সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কেবল দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে ভারত স্বাধীন হ'তে চলেছে, —অচিরে স্বাধীন হ'তে চলেছে।

"বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস হোক! স্বাধীন ভারত দীর্ঘায়ু হোক। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

ডঃ [illegible] মুখোপাধ্যায়ের
পর্বতাপের মধ্যত্ব (৪র্থ সং) ৬৲
রাষ্ট্রসংঘের এক অধ্যায় ২৲

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের
বৈদেশিকী (২য় সং) ৩৲

অতুল চন্দ্র গুপ্তের
সমাজ ও বিবাহ ১।০

সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদারের
সমাজ ও সাহিত্য (২য় সং) ২।০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ভাবীকাল ৩৲
ছড়িয়ে ছড়িয়ে ২৲
কুহকের দেশে ২।০

[illegible]গোপাল সেনগুপ্তের
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ (২য় সং) ১।০
যৌবন জলতরঙ্গ ১।০

বিভূতী মুখোপাধ্যায়ের
ভাগীরথী বহে ধীরে ২।০
জলে জাগে ঢেউ ২।০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বিষের ধোঁয়া (৩য় সং) ৩৲
পঞ্চভূত ১৸০ [illegible] ১।০
গোপন কথা ২।০ বুমেরাং ২।০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
বিরহ লক্ষী ২৸০
কাঠ-খড়-কেরোসিন ১৸০
আসমান জমিন ২।০

প্রবোধ কুমার সান্যালের
কলরব দুই টাকা [illegible] ৩য় সং ২৲
দেখা ও জানা (৩য় সং) ২।০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
তিমির তীর্থ ২।০
বীতংস দুই টাকা দুঃশাসন ২৲
স্বর্ণসীতা ২।০ সূর্যসারথী ৩৲

[illegible]
[illegible] (বেরিয়াম অনূদিত) ২।০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালা

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের
দিল্লী চলো ২।০

নীহার রঞ্জন গুপ্তের
মুক্তি পতাকা তলে ২।০

জ্যোতি প্রসাদ বসুর
নেতাজী ও আজাদ
হিন্দ ফৌজ ২।০

শান্তিলাল রায়ের
আরাকান ফ্রন্টে ২৲

রাসবিহারী বসুর
বিপ্লবীর আহ্বান ১।০

নৃপেন্দ্র নাথ সিংহের
ভারত ছাড় ২।০

সত্যেন্দ্র নাথ বসুর
জাপানী বন্দী-শিবিরে ২।০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
জয়বেণী ৩৲ রাজপথ ৪৲
আশাবরী ৩।০ দিকশূল ৪।০
অমূল তরু (২য় সং) ৩৲

মনোজ বসুর
শত্রু পক্ষের মেয়ে ৩।০
সৈনিক (৩য় সং) ৩।০
ভুলি নাই (৮ম সং) দুই টাকা
ওগো বধূ সুন্দরী (২য় সং) ২৲
একদা নিশীথকালে ২।০
নূতন প্রভাত (৩য় সং) ১৸০
প্লাবন (২য় সং) ১।০
পৃথিবী কাদের (২য় সং) ১।০
বনমর্মর ৩য় সং আড়াই টাকা
নরবাঁধ (৩য় সং) দুই টাকা
আগষ্ট ১৯৪২ ৩।০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রতিবিম্ব ১৸০ চিন্তামণি ১৸০
দিবারাত্রির কাব্য ২য় সং ২৸০

[illegible]ন্দু ঘোষের
ডাক দিয়ে যাই ৩য় সং ৩৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ৫৲
হারানো সুর (২য় সং) ৩৲
চৈতালী ঘূর্ণি (৪র্থ সং) ২৲
দীপান্তর (২য় সং) ১।০

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গোটা মানুষ ২।০

গোপাল ভৌমিকের
ভারতের মুক্তি সাধক (২য় সং) ২।০

মহেন্দ্রচন্দ্র রায়ের
পরম তৃষা ৪৲
ম্যাজিক পক্ষী ৩।০
নব মন্দির ২৲

সরোজকুমার রায় চৌধুরীর
মহাকাল ৩।০
১৩৩২-র সেরা গল্প ৪৲

সুবোধ ঘোষের
গ্রামযমুনা দুই টাকা রূপবতী ২৲

শৈল চক্রবর্তীর
যাদের বিয়ে হল (৩য় সং) ৩।০
কার্টুন দুই টাকা কৌতুক ১।০
যাদের বিয়ে হবে ৩৲

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্যের
কংগ্রেস-সংগঠনে বাংলা ১।০

ওয়েণ্ডেল উইল্কির
ওয়ান ওয়ার্লড (২য় সং) ৩।০

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের
একাকিনী নায়িকা ২।০

প্রমথনাথ বিশীর
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য ২৲
ডাকিনী ১।০
পরিহাস বিজল্পিতম্ ১।০

বনফুলের
আরও কয়েকটি ২৲
বনফুলের গল্প (২য় সং) ২৲
নঞতৎপুরুষ ৩৲
ভুয়োদর্শন ২য় সং ৩৲

[illegible]